Cadence

BUP MAGAZINE 2018

Bangladesh University of Professionals (BUP)

বিইউপি বার্ষিক ম্যাগাজিন - ২০১৮

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্ (বিইউপি)
মিরপুর সেনানিবাস, ঢাকা।

Cadence

প্রকাশকাল	:	ডিসেম্বর ২০১৮
বিইউপি বার্ষিক প্রকাশনা	:	১ম
প্রকাশক	:	বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্
সার্বিক তত্ত্বাবধান ও পৃষ্ঠপোষকতা	:	মেজর জেনারেল মোঃ এমদাদ উল বারী এনডিসি, পিএসসি, টিই
প্রকাশনায়	:	পাবলিক রিলেশন, ইনফরমেশন অ্যান্ড পাবলিকেশন্স, বিইউপি। Phone : +৮৮-০২-৮০০০৪৭১, Fax : +৮৮-০২-৮০০০৪৪৩ E-mail : info@bup.edu.bd, www.bup.edu.bd
আলোকচিত্র	:	ওসমান গনি সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা
প্রচ্ছদ	:	আফিয়া তাসনিম প্রমি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ব্যাচ-২০১৭
গ্রাফিক্স ও অঙ্গসজ্জা	:	মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন
মুদ্রণ	:	রাইয়্যান প্রিন্টার্স ৩৩৭ বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট, কাঁটাবন, ঢাকা-১০০০ ফোনঃ ০১৯১৫৮৮৩৩৩৫ ই-মেইল : raiyanprinters2710@gmail.com

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

মেজর জেনারেল মোঃ এমদাদ উল বারী, এনডিসি, পিএসসি, টিই

উপদেষ্টা
প্রফেসর এম আবুল কাশেম মজুমদার, পিএইচডি

প্রধান সমন্বয়কারী
এয়ার কমডোর মোঃ আমিনুল ইসলাম, এনডিইউ, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, জিডি(পি)

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান সম্পাদক
গ্রুপ ক্যাপ্টেন মোঃ সাইফুল ইসলাম, ইঞ্জিঃ

সদস্য
লেঃ কর্নেল তৌহিদুল ইসলাম (অবঃ)

সদস্য
সহযোগী অধ্যাপক
ড. জিয়াউর রহমান

সদস্য
সহযোগী অধ্যাপক
ড. ফাহমিদা হক

সদস্য
সহযোগী অধ্যাপক
ড. মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন

সদস্য
অতিরিক্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
মোহাম্মদ শওকত ওসমান

সদস্য
অতিরিক্ত পরিচালক
মোঃ জাহাঙ্গীর কবীর

সদস্য
শাখা কর্মকর্তা
মুহাম্মাদ কাউছার মাহমুদ

বাণী

উপাচার্য
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্
মিরপুর সেনানিবাস, ঢাকা।

আলোকিত মানুষ ও দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করাই শিক্ষার লক্ষ্য। শুধু পাঠ্যপুস্তকে আবদ্ধ থেকে প্রকৃত শিক্ষা অর্জন করা সম্ভব নয়। এ জন্য দরকার সহপাঠ্য কার্যক্রম যা শিক্ষার্থীদের প্রতিভাকে আরও বিকশিত করবে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্ (বিইউপি) কর্তৃক প্রথমবারের মতো বিইউপি ম্যাগাজিন-২০১৮ প্রকাশ সত্যিই সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত। অভিজ্ঞ শিক্ষক, কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন গল্প, কবিতা, ছড়া, রম্যরচনা, ভ্রমণকাহিনী, বিজ্ঞান ও শিক্ষামূলক রচনা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বিভিন্ন রচনাসমূহ ম্যাগাজিনে স্থান পাবে, যা ভবিষ্যতে তাঁদের আধুনিক চিন্তামনস্ক নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

বিইউপির পথচলা দীর্ঘদিনের না হলেও ইতোমধ্যে এর সাফল্য জাতীয় প্রেক্ষাপট পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও ছড়িয়ে পড়েছে। তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি বাস্তবধর্মী অনেক শিক্ষা কার্যক্রমই এখানে চলমান। বিইউপি ম্যাগাজিন সত্যিকার অর্থে নতুন নতুন প্রতিভার জন্ম দিবে, যাঁরা দেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিজেদের সৃজনশীলতার স্বাক্ষর রাখবে বলে আমি আশা করছি।

পরিশেষে, এ ম্যাগাজিনের সাথে জড়িত যাঁরা নিজেদের শ্রম, মেধা এবং নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁদের প্রতি রইলো আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন। আমি এ বিইউপি ম্যাগাজিনের সর্বাঙ্গীন সফলতা একান্তভাবে কামনা করছি।

মেজর জেনারেল মোঃ এমদাদ উল বারী, এনডিসি, পিএসসি, টিই

বাণী

উপ-উপাচার্য
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্
মিরপুর সেনানিবাস, ঢাকা।

এই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের একাডেমিক দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সৃজনশীল কাজের দক্ষতা বাড়াতেও সদা সচেষ্ট। এই লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় হতে 'Cadence' নামক একটি ম্যাগাজিন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি সত্যিই আনন্দিত। শিক্ষক, কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থীদের সহমত ও মেধার বিকাশ সাধনের নিমিত্তে ও তাদের সৃষ্টিশীলতাকে ছড়িয়ে দেবার লক্ষ্যে এই ম্যাগাজিনটি প্রকাশ করার উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই।

২০০৮ সালে যাত্রা শুরু করে এ বিশ্ববিদ্যালয় আজ বাংলাদেশের এক মহীরুহে পরিণত হয়েছে। অল্প সংখ্যক শিক্ষার্থী নিয়ে এর কলেবর শুরু হলেও বর্তমানে এর পরিধি অনেক বিস্তৃত। এখানে হাজার হাজার শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত আছেন। সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই মানুষ নিজেকে অন্যের কাছে প্রকাশ করতে চায়, যা একটি সহজাত গুণ। প্রথমবারের মত প্রকাশিত এই ম্যাগাজিনে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের সহজাত প্রবৃত্তি বিকশিত হবে বলে আমি মনে করি। এ ম্যাগাজিনকে ঘিরে সকলের মাঝে তীব্র উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখে আমি সত্যিই আনন্দিত ও অভিভূত।

শিক্ষার্থীদের মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য সহশিক্ষা কার্যক্রম শিক্ষার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে-'অন্তরের জিনিসকে বাহিরের, ভাবের জিনিসকে ভাষায়, নিজের জিনিসকে বিশ্ব মানবের ও ক্ষণকালের জিনিসকে চিরকালের করে তোলা সাহিত্যের কাজ।' ম্যাগাজিনটি এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে সৃজনশীলতা প্রকাশের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করবে বলে আমি মনে করি। ম্যাগাজিনের বিভিন্ন লেখনিসমূহ যেমন গল্প, কবিতা, ছোট গল্প, ভ্রমণ কাহিনী, বিজ্ঞান বিষয়ক লেখা, রম্যরচনা ইত্যাদি ভবিষ্যতে তাদেরকে মননশীল ও আধুনিক চিন্তামনস্ক নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করবে।

এ প্রকাশনার সাথে জড়িত সকলের প্রতি রইলো আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। আমি এ ম্যাগাজিনের সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করছি। সামনের দিনগুলোতে এই প্রতিষ্ঠান তার সৃজনশীল কর্মযজ্ঞ আরও বাড়াতে সক্ষম হবে বলে আশা করছি। খোদা হাফেজ।

প্রফেসর এম আবুল কাশেম মজুমদার, পিএইচডি

সম্পাদকীয়

প্রধান সম্পাদক
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্
মিরপুর সেনানিবাস, ঢাকা।

সাহিত্য চর্চা মানব মনের ভাবগুলোকে প্রস্ফুটিত করে সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য লালনের সহায়ক হিসেবে কাজ করে। অনুরূপভাবে শিক্ষা মানুষের চেতনাশক্তিকে শাণিত করে, ন্যায়-অন্যায় বোধকে জাগ্রত করে। কেবল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দ্বারা এই বিষয়গুলো অর্জন করা সম্ভব হয় না। সৃজনশীল লেখনী মননবিকাশের একটি অতি জরুরী উপাদান যা সহপাঠ্যক্রম হিসেবে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশে সহায়ক। সেই সহপাঠ্যক্রমের অংশ হিসেবে বিইউপির বার্ষিক ম্যাগাজিন 'Cadence' প্রথমবারের মত প্রকাশিত হওয়া সত্যিই এক আনন্দের ব্যাপার এবং প্রশংসার দাবিদার।

আমাদের শিক্ষার্থীদের আনন্দ ও উৎসাহের অভিব্যক্তি এই ম্যাগাজিন 'Cadence'। প্রথমবারের মত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থীদের লেখনীর মাধ্যমে ফুটে উঠেছে শিক্ষা ও সাহিত্যের এই প্রাণাধার। এখানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ছোট গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, ভ্রমণকাহিনী ও রম্যরচনাসহ আরও অনেক কিছু। এ প্রকাশনা শিক্ষার্থীদের চিন্তাচেতনা ও অনুভূতি প্রকাশের একটি সুন্দর মাধ্যম যেখানে তারা সৃষ্টিশীল প্রতিভার বিকাশ ও প্রদর্শনের সুযোগ লাভ করতে পারে।

মাননীয় উপাচার্য ও উপ-উপাচার্য মহোদয় তাঁদের মূল্যবান বাণী প্রদান করে এ ম্যাগাজিনকে করেছেন সমৃদ্ধ। আমি সবাইকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। এছাড়াও সম্মানিত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থী যাদের লেখনী দ্বারা বিইউপির ম্যাগাজিন 'Cadence' পূর্ণতা লাভ করেছে তাদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

সম্পাদনা পর্ষদের প্রতিটি সদস্যকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। এছাড়া যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ম্যাগাজিনটি প্রকাশনায় সার্বিক সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

বিইউপি ম্যাগাজিন শিক্ষার্থীদের সাহিত্য চর্চায় উৎসাহিত করবে ও প্রতিভা বিকাশের সুযোগ করে দিবে এবং পাঠকের হৃদয়ে অনাবিল আনন্দ দিবে এই আমাদের প্রত্যাশা।

গ্রুপ ক্যাপ্টেন মোঃ সাইফুল ইসলাম, ইঞ্জিঃ

সূচিপত্র
বিইউপি ম্যাগাজিন-২০১৮

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
বিইউপির এক দশক : সাফল্যের সোপান	মুহাম্মাদ কাউছার মাহমুদ	০১-০৭
বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে প্রশাসনিক সংস্কার (১৯৭২-৭৫): একটি মূল্যায়ন	প্রফেসর এম আবুল কাশেম মজুমদার, পিএইচডি	০৮-১২
সুদযুক্ত ঋণ নয়, দারিদ্র্য বিমোচনে জাকাতের ভূমিকা অনন্য	আল জামাল মোস্তফা সিদ্দাইনী (তমাদ)	১৩-১৪
সীমাবদ্ধতার সীমানা পেরিয়ে	ড. মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন	১৫-১৬
ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক	শায়লা সোলায়মান	১৭-১৮
বই, বইমেলা, বই দিবস ও অন্যান্য	এমদাদ উল্লাহ বিন শহীদ	১৯-২১
প্রকৃতির মানুষ, আইন ও নৈতিকতা	তাসমিয়া সাবেরা	২২
জেনেটিক্স : জীবনের রহস্যময় বিজ্ঞান	তোফায়েল আহমেদ	২৩-২৬
রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো : অনন্য বন্ধুতার উপাখ্যান	ড. মোঃ মোহসীন রেজা	২৭-৩০
ঈদ-ই-মিলাদুন্নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রসঙ্গ	মোহাম্মদ শওকত ওসমান	৩১
অহনা	মোঃ রুহুল কুদ্দুস	৩২-৩৪
কল্পলোকে অবন্তি	সৈকত সরকার	৩৫-৩৭
দাহকাল	ফয়সাল আহমেদ পিয়াস	৩৮-৪২
পর্দার পেছনে	সৌমেন গুহ	৪৩-৪৬
মৃতপুরীর আধার	ফাহিম চৌধুরী তাজিম	৪৭-৪৮
নিরাপত্তার মাঝে অনিরাপত্তা	আজমীর হোসেন	৪৯
তনয়	আব্দুল্লাহ আর রাকিব	৫০

সূচিপত্র
বিইউপি ম্যাগাজিন-২০১৮

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
প্রশ্নপত্র	জোবায়ের হোসেন	৫১
শীতের সকাল	মেহেদী হাসান	৫২
প্রিয় বাংলাদেশ	মোছাঃ শরীফা ইয়াসমিন	৫৩
প্রশ্ন	তাহমিনা সুলতানা	৫৪
মুহূর্তের খোয়াবে	আল জামাল মোস্তফা সিন্দাইনী	৫৫
মা	মুহাম্মাদ কাউছার মাহমুদ	৫৬
হিমালয় মুগ্ধতা	ফৌজিয়া আহমেদ	৫৭-৫৮
লিলি ফুলের দ্বীপে	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, পিএইচডি	৫৯-৬০
নীল পানির সন্ধানে	তোফায়েল আহমেদ	৬১-৬২
Freedom from Stress	Fahmida Jerin Anim	৬৩-৬৪
Victim or Victor?	Tahsina Zaheen	৬৫-৬৭
REMINISCENCE	Tasnim Naz	৬৮-৬৯
I Long for That Day	Zulker Nayen Mahmud	৭০
A Beautifully Meaningless Waste	K.M Arefin	৭১
Time for Everything	Muhammad Shafiuddin	৭২
TABLE MOUNTAIN – A WONDER OF NATURE	Major Mohammad Mahmudur Rahman Niaz, psc	৭৩-৭৫
Visit to 'Jamhuri ya Uganda'	Wing commander Nasrin Sultana Siddiqua, psc	৭৬-৭৯
আলোকচিত্রে বিইউপি	-	৮০-৯৬

বিইউপির এক দশক সাফল্যের সোপান

মুহাম্মাদ কাউছার মাহমুদ
শাখা কর্মকর্তা

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্ (বিইউপি) দেশের ২৯তম পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে 'জ্ঞানের মাধ্যমে উৎকর্ষ সাধন' ব্রত নিয়ে ২০০৮ সালের ৫ জুন কার্যক্রম শুরু করে। সূচনালগ্নে ছোট্ট পরিসরে এর পরিধি বিরাজমান থাকলেও সময়ের পরিক্রমায় তা বিশাল আকার ধারণ করেছে। সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত বিইউপি বাংলাদেশের একমাত্র পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তিবর্গ একইসাথে পড়াশোনা ও গবেষণার সুযোগ পেয়ে থাকেন। এখানে সাধারণ পরিবারের বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী লেখাপড়া করেন। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম বিশেষত্ব হলো এর ক্যাম্পাস রাজনীতি ও সেশনজটমুক্ত। ফলে শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষা কার্যক্রম নির্বিঘ্নে পরিচালনা করতে পারে। বিইউপির অধিভুক্ত ৫৬টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেখানে হাজার হাজার শিক্ষার্থী বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যয়নরত। এ সকল অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানে প্রকৌশল, চিকিৎসা, সাধারণ শিক্ষা, সমরবিদ্যা, যুদ্ধকৌশল, সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ে সার্টিফিকেট কোর্স, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমাসহ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে অন্যূন ১০১ ধরনের ডিগ্রি/কোর্স/প্রোগ্রাম পরিচালিত হয়ে থাকে।

একাডেমিক পরিচিতি : বিইউপিতে পাঁচটি ফ্যাকাল্টি রয়েছে, যথা- ফ্যাকাল্টি অব বিজনেস স্টাডিজ, ফ্যাকাল্টি অব সিকিউরিটি অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ, ফ্যাকাল্টি অব সাইন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, ফ্যাকাল্টি অব আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সাইন্স এবং ফ্যাকাল্টি অব মেডিক্যাল স্টাডিজ। এ ফ্যাকাল্টিসমূহের অধীনে ১৬টি বিভাগ রয়েছে, যথা বিএ (অনার্স) ইন ইংলিশ, বিএসএস (অনার্স) ইন পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, বিএসসি (অনার্স) ইন ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি, বিএসসি (অনার্স) ইন এনভায়রনমেন্টাল সাইন্স, বিএসএস (অনার্স) ইন ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, বিএসএস (অনার্স) ইন ডিজাস্টার অ্যান্ড হিউম্যান সিকিউরিটি ম্যানেজমেন্ট, বিএসএস (অনার্স) ইন ইকোনোমিক্স, বিএসএস (অনার্স) ইন ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস্, এলএলবি (অনার্স), বিএসএস (অনার্স) ইন সোশিওলজি, বিএসএস (অনার্স) ইন মাস কমিউনিকেশন অ্যান্ড জার্নালিজম, বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন জেনারেল, বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেম, বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং, বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ এবং বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন মার্কেটিং। এছাড়াও উচ্চতর গবেষণার জন্য এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রির পাশাপাশি ৯টি স্নাতকোত্তর ডিগ্রি চালু রয়েছে। ডিগ্রিসমূহ হলো মাস্টার অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, এমবিএ (প্রফেশনাল), মাস্টার অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, মাস্টার অব ডিজাস্টার অ্যান্ড হিউম্যান সিকিউরিটি ম্যানেজমেন্ট, মাস্টার অব ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি, মাস্টার অব ইনফরমেশন সিস্টেম সিকিউরিটি, এলএল এম, মাস্টার অব পিস, কনফ্লিক্ট অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস্ স্টাডিজ এবং এমএসসি ইন এনভায়রনমেন্টাল সাইন্স। বিইউপিতে বর্তমানে নয়টি ভাষা শিক্ষা কোর্স চালু রয়েছে, যথা ফরাসি, আরবি, চাইনিজ, তুর্কি, রাশিয়ান, জার্মান, জাপানিজ, ইংলিশ ও বার্মিজ।

নিজস্ব ফ্যাকাল্টিসমূহের শিক্ষার্থীর সংখ্যা

ক্রমিক নং	ফ্যাকাল্টির নাম	প্রোগ্রামসমূহের নাম	শিক্ষার্থীর সংখ্যা		মোট শিক্ষার্থী
			ছাত্র	ছাত্রী	
০১	ফ্যাকাল্টি অব আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সাইন্স (এফএএসএস)	বিএসএস অনার্স ইন ডিজাস্টার অ্যান্ড হিউম্যান সিকিউরিটি ম্যানেজমেন্ট	১২৪	১১০	২৩৪
		বিএসএস অনার্স ইন ইকনোমিক্স	২২৩	১৫৬	৩৭৯
		বিএ অনার্স ইন ইংলিশ	৫২	৮৮	১৪০
		বিএসএস অনার্স ইন পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন	৮৬	৫৭	১৪৩

ক্রমিক নং	ফ্যাকাল্টির নাম	প্রোগ্রামসমূহের নাম	শিক্ষার্থীর সংখ্যা		মোট শিক্ষার্থী
			ছাত্র	ছাত্রী	
০১	ফ্যাকাল্টি অব আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সাইন্স (এফএএসএস)	বিএসএস অনার্স ইন ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ	৭০	৬৫	১৩৫
		বিএসএস অনার্স ইন সোশিওলোজি	৫২	৪৩	৯৫
		মাস্টার অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ	২৫	২৬	৫১
উপমোট			৬৩২	৫৪৫	১১৭৭

ক্রমিক নং	ফ্যাকাল্টির নাম	প্রোগ্রামসমূহের নাম	শিক্ষার্থীর সংখ্যা		মোট শিক্ষার্থী
			ছাত্র	ছাত্রী	
০২	ফ্যাকাল্টি অব বিজনেস স্টাডিজ (এফবিএস)	বিবিএ-জেনারেল	২৮৭	১৭৩	৪৬০
		বিবিএ ইন ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং	১৭১	১০৬	২৭৭
		বিবিএ ইন অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস	১৮৫	৯০	২৭৫
		বিবিএ ইন মার্কেটিং	১৯৯	৮২	২৮১
		বিবিএ ইন ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ	১৭৩	১০৬	২৭৯
		এমবিএ	৫৬	৩৩	৮৯
		এমবিএ (প্রফেশনাল)	৩৫৭	১৭৭	৫৩৪
উপমোট			১৪২৮	৭৬৭	২১৯৫
০৩	ফ্যাকাল্টি অব সিকিউরিটি অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (এফএসএসএস)	বিএসএস অনার্স ইন আইআর	১৮৫	১৭৯	৩৬৪
		এলএলবি অনার্স ইন ল	১৪৭	১৩০	২৭৭
		বিএসএস অনার্স ইন মাস কমিউনিকেশন অ্যান্ড জার্নালিজম	৫৮	৪১	৯৯
		মাস্টার অব ল	৭৫	৪৬	১২১
		মাস্টার অব পিস, কনফ্লিক্ট অ্যান্ড হিউম্যান রাইট্স স্টাডিজ	২০	১২	৩২
উপমোট			৪৮৫	৪০৮	৮৯৩
০৪	ফ্যাকাল্টি অব সাইন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (এফএসটি)	বিএসসি ইন আইসিই	২৩৬	১৪৪	৩৮০
		বিএসসি অনার্স ইন এনভায়রনমেন্টাল সাইন্স	৫৮	৪৪	১০২
		মাস্টার অব ইনফরমেশন সিস্টেম সিকিউরিটি	১০৪	১২	১১৬
		মাস্টার ইন ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি	৮০	১৬	৯৬
		মাস্টার অব এনভায়রনমেন্টাল সাইন্স	১৫	৭	২২
উপমোট			৪৯৩	২২৩	৭১৬

সর্বশেষ হালনাগাদ : ১৫ নভেম্বর ২০১৮

বিইউপির গ্রাজুয়েটের পরিসংখ্যান : প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিইউপির অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান ও নিজস্ব ফ্যাকাল্টি থেকে এ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে ১৩ হাজার ১৩ জন শিক্ষার্থী ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ডিগ্রিভিত্তিক পরিসংখ্যান নিচে দেওয়া হলো:

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রোগ্রাম/পরীক্ষার নাম	ছাত্র	ছাত্রী	মোট (ডিগ্রি অনুযায়ী)	মোট (প্রতিষ্ঠান অনুযায়ী)
১	এনডিসি	এমফিল	৭৫	১	৭৬	৪২৮
		মাস্টার অব স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ	৩৫১	১	৩৫২	
২	জিএসসিএসসি	এমএসসি ইন মিলিটারি স্টাডিজ	১৯৫৪	৪৬	২০০০	২০০০
৩	এমআইএসটি	বিএসসি ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং	৩৭৬	১৬০	৫৩৬	২৭০৬
		বিএসসি ইন কম্পিউটার সাইন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং	৩১১	২৬২	৫৭৩	
		বিএসসি ইন ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং	৩৯৮	১৯৩	৫৯১	
		বিএসসি ইন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং	৪৫৮	১১৮	৫৭৬	
		বিএসসি ইন অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং	২৭১	৮৩	৩৫৪	
		বিএসসি ইন নেভাল আর্কিটেকচার অ্যান্ড মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং	৪১	২৩	৬৪	
		এমএসসি ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং	৬	-	৬	
		এমএসসি ইন ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং	৪	-	৪	
		এমএসসি ইন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং	১	-	১	
		পিএইচডি ইন সিই	১	-	১	
৪	এএফএমসি	এমবিবিএস	৩৮৪	৪২৬	৮১০	৮১০
৫	এএফএমআই	এমফিল ইন এইচএইচএম	২২	১	২৩	৬২৬
		মাস্টার্স ইন পাবলিক হেলথ (হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট)	৫১	৩	৫৪	
		মাস্টার্স ইন পাবলিক হেলথ (পাবলিক হেলথ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন)	৪২	১	৪৩	
		পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা	১০৭	৬২	১৬৯	
		বিএসসি ইন নার্সিং	-	৩৩৭	৩৩৭	
৬	বিএমএ	বিএ (পাস)	২১৮	৪২	২৬০	১৫৮৮
		বিএসসি (পাস)	৩৬৭	২৩	৩৯০	
		বিএসসি ইন মিলিটারি স্টাডিজ	৮৭৫	৬৩	৯৩৮	
৭	বিএনএ	বিএসসি (পাস)	৩২৭	১৪	৩৪১	৩৭২
		বিএনএস (পাস)	৩১	-	৩১	
৮	বিএএফএ	বিএ (পাস)	৪	৩	৭	৩৮০
		বিএসসি (অ্যারোঃ)	২৫৯	৬৩	৩২২	
		বিবিএস (পাস)	৩৯	১২	৫১	

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রোগ্রাম/পরীক্ষার নাম	ছাত্র	ছাত্রী	মোট (ডিগ্রি অনুযায়ী)	মোট (প্রতিষ্ঠান অনুযায়ী)
৯	এসিঅ্যান্ডএস	এমএসসি (টেকনিক্যাল)	২১৮	-	২১৮	২১৮
১০	প্রয়াস	ব্যাচেলর অব স্পেশাল এডুকেশন (বিএসএড)	১৬	৭৫	৯১	১০৭
		পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন এসএলটিএ	২	১৪	১৬	
১১	এমআইবিএ সাভার	এমবিএ	৯	--	৯	৯
১২	এমআইবিএ সিলেট	ইভিনিং এমবিএ	৮	৩	১১	১১
১৩	একআইএস	এভিয়ান ইনস্ট্রাক্টরস পোস্টগ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা	১৮	-	১৮	১৮
১৪	বিএ/বিএসএস (পাস) অফিস, বিইউপি	বিএ (পাস)	৫২২	১৬	৫৩৮	১৭৫৯
		বিএসএস (পাস)	১১৫৬	৬৫	১২২১	-
১৫	বিডিএস (পাস) অফিস, বিইউপি	ব্যাচেলর অব ডিফেন্স স্টাডিজ (পাস)	৬৫	-	৬৫	৬৫
১৬	এফবিএস, বিইউপি	এমবিএ	২৫৩	১১৫	৩৬৮	১৫৮৩
		এক্সিকিউটিভ এমবিএ (ইএমবিএ)	৮৭	১০	৯৭	
		ইভিনিং এমবিএ/এমবিএ (প্রফেশনাল)	৫৯৩	১৯৯	৭৯২	
		বিবিএ	১৮৯	১৩৭	৩২৬	
১৭	একএসএসএস, বিইউপি	ব্যাচেলর অব সিকিউরিটি স্টাডিজ (বিএসএস)	৪৩	-	৪৩	৭২
		মাস্টার অব পিস অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (এমপিএইচআরডিএস)	২৪	৫	২৯	
১৮	একএসটি, বিইউপি	এমআইএসএস	৯৫	৬	১০১	১৩৩
		এমআইসিটি	৩০	২	৩২	
১৯	একএএসএস, বিইউপি	মাস্টার অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (এমডিএস)	৩২	১১	৪৩	১০৪
		মাস্টার অব ডিজাস্টার অ্যান্ড হিউম্যান সিকিউরিটি অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (এমডিএইচএসম)	৫২	৯	৬১	
২০	সিএইচএসআর, বিইউপি	পিএইচডি	১১	১	১২	২৪
		এমফিল	৮	৪	১২	
সর্বমোট			১০৪০৪	২৬০৯		১৩০১৩

বিইউপি জার্নাল : 'BUP Journal' নামে বিইউপির নিজস্ব গবেষণা জার্নাল আছে। প্রতি ছয়মাস অন্তর এটি প্রকাশিত হয়, যার ISSN নম্বর হচ্ছে ২২১৯-৪৮৫১। জার্নালে বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণাধর্মী আর্টিকেলসমূহ স্থান পেয়ে থাকে। বিইউপির শিক্ষক, কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থীরা ছাড়াও বাইরের গবেষকগণের গবেষণাধর্মী আর্টিকেলও উক্ত জার্নালে প্রকাশিত হয়ে থাকে।

খেলাধুলা : বিইউপিতে বছরজুড়ে বিভিন্ন প্রকার খেলাধুলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ক্রিকেট, ফুটবল, ব্যাডমিন্টন, হ্যান্ডবল, ভলিবল ইত্যাদি খেলাসমূহ আয়োজন করার পাশাপাশি আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন ক্রীড়া ফেডারেশনের প্রায় সব প্রতিযোগিতায় বিইউপির শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে।

বঙ্গবন্ধু চেয়ার প্রতিষ্ঠা : জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনদর্শন, মতাদর্শ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ বাস্তবায়নে গবেষণার উদ্দেশ্যে বিইউপিতে 'বঙ্গবন্ধু চেয়ার' নামে গবেষণা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি এ গবেষণা প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। এ গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রথম অধ্যাপক হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে এই প্রতিষ্ঠানের অধীনে গবেষণা কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

অবকাঠামোগত উন্নয়ন : সেনাবাহিনী কর্তৃক প্রদানকৃত ১০ একর জমিতে দুটি ৬তলা বিশিষ্ট ভবনের মাধ্যমে বিইউপির যাত্রা শুরু হলেও সম্প্রতি একটি ৬তলা ভবন ১৪তলা পর্যন্ত সম্প্রসারণ, একটি ডে-কেয়ার সেন্টার প্রতিষ্ঠা, একটি মাল্টিপারপাস শেড তৈরি, বিইউপি লেকের পশ্চিমপার্শ্বে সিঁড়ি তৈরির কাজ সম্পন্ন এবং একাডেমিক কাম প্রশাসনিক ভবন নির্মাণসহ আরও নানামুখী উন্নয়নমূলক কাজ চলমান রয়েছে। প্রতিষ্ঠার দুই বছরেই অস্থায়ী ছাত্রহল চালু করা হয়েছে এবং ক্রমবর্ধমান চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এর পরিসর ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করা হচ্ছে। অধিগ্রহণকৃত চার একর জমিতে একাডেমিক ভবন, ল্যাবরেটরি ভবন এবং ইউটিলিটি কাম সিকিউরিটি ভবন নির্মাণ করা হবে। একই সাথে সেন্টার ফর হায়ার স্টাডিজ অ্যান্ড রিসার্চ, সেন্টার ফর মডার্ন ল্যাংগুয়েজেজ ভবন, লাইব্রেরি ভবন নির্মাণেরও পরিকল্পনা করা হয়েছে। শিক্ষা ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য 'বিইউপি রূপকল্প ২০৩০' প্রণয়ন করা হয়েছে, যা তিনটি পর্যায়ে বাস্তবায়িত হবে। বর্তমানে প্রথম পর্যায়ের কাজ চলমান রয়েছে।

বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপন ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড : বিইউপির গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দিবসসমূহ যেমন : স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ইত্যাদি যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদ্‌যাপন করে থাকে। একইসাথে যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে জাতীয় শোক দিবস পালন করে থাকে। এছাড়া বিইউপি প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী (BUP Day), নবীনবরণ, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ওয়ার্কশপ, যুগোপযোগী বিষয় নিয়ে সেমিনার ইত্যাদি পরিচালনা ও উদ্‌যাপন করা হয়ে থাকে। লেখা-পড়ার পাশাপাশি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে অংশ নিয়ে থাকে, যা তাদের সৃজনশীলতা ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এ সব শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে বিইউপি সদা আন্তরিক। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে ১৬টি ক্লাব রয়েছে, যে ক্লাবসমূহ বছরজুড়ে বহুবিধ কর্মকাণ্ড আয়োজন করে থাকে। তন্মধ্যে পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপন, বর্ষবরণ, বিইউপি মডেল ইউনাইটেড নেশন্স, ক্যারিয়ার ফেয়ার, বিতর্ক প্রতিযোগিতা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসসমূহে আলোচনাসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

তথ্য-প্রযুক্তি : বিইউপি ডিজিটালাইজেশনে আইসিটি সেন্টার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিইউপির সকল একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম যথাসম্ভব স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্লানিং বা ইআরপি সিস্টেম ডেভেলপ করা হয়েছে, ইআরপি সিস্টেমের আওতায় বিভিন্ন সফটওয়্যার, অ্যাপ্লিকেশন বা মডিউল তৈরি করা হয়েছে এবং কিছু কার্যক্রম এখনও চলমান রয়েছে। উল্লেখযোগ্য ডিজিটালাইজেশনের মধ্যে বিইউপির হিসাব শাখার সকল কার্যক্রম সংরক্ষণ, পেমেন্ট, অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড পে-রোল ছাড়াও যাবতীয় হিসাব নিকাশ ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। বিইউপির যানবাহন রিকুইজিশন, অনুমোদন ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমও ইআরপি সিস্টেমের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া ডিজিটাল ইনভেন্টরির মাধ্যমে বিইউপির সকল দ্রব্য সামগ্রীর হিসাব ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করা হয়। সকল দ্রব্যাদি ইস্যু, রিটার্ন, লেজার ও অকশন কার্যক্রম ইআরপি সিস্টেমের মাধ্যমে পরিচালনা করা হয়, এতে বিইউপির সামগ্রিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়। ছাত্রছাত্রীদের সাথে শিক্ষক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম ইআরপি সিস্টেমের আওতায় পরিচালিত হয়। শ্রেণিকক্ষের হাজিরা, অ্যাসাইনমেন্ট, পরীক্ষার ফলাফল সবকিছুই অটোমেশন সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত। এরই ধারাবাহিকতায় শিক্ষার্থীদের পাঠদানের জন্য শ্রেণিকক্ষসমূহ ডিজিটালাইজেশন করা হয়েছে। যার মধ্যে প্রতিটি শ্রেণিকক্ষে কম্পিউটার, টাচ ফ্রিন সুবিধা সংবলিত সর্ট থ্রু প্রজেক্টর ও সাউন্ড সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সহায়ক ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য শ্রেণিকক্ষসমূহ, কম্পিউটার ল্যাব, সাইবার

সেন্টার এবং ল্যাংগুয়েজ সেন্টারে ইন্টারনেট সংযোগসহ প্রায় ৭০০টি কম্পিউটার স্থাপন করা হয়েছে। বিইউপির সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও ছাত্রছাত্রীর জন্য ক্যাম্পাস বা হল সকল জায়গায় উচ্চ গতিসম্পন্ন ওয়াইফাই সংযোগ বিদ্যমান। ইউজিসি কর্তৃক "উচ্চশিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্প" এর আওতায় "বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্ -এ ক্যাম্পাস নেটওয়ার্ক স্থাপন" সাব-প্রজেক্ট এর জন্য এ বিশ্ববিদ্যালয়কে নির্বাচন করা হয়েছে। সাব-প্রজেক্টের অধীনে ভার্চুয়াল শ্রেণিকক্ষ স্থাপন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানের সাথে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যোগাযোগ, ক্লাস পরিচালনা ও গবেষণা কার্যক্রম চলমান আছে। অতিসম্প্রতি ওয়েববেইজড ডিজিটাল আর্কাইভের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কার্যক্রমের রেকর্ড ধারাবাহিকভাবে অন্তর্ভুক্ত ও সংরক্ষণ করার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বিইউপির সার্বিক নিরাপত্তা ও প্রবেশ নিয়ন্ত্রণের জন্য বিইউপি ক্যাম্পাসে ভিডিও সার্ভিলেন্স সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া বিইউপির মূল প্রবেশ পথে ব্যাগেজ স্ক্যানার ও হিউম্যান আর্চওয়ে স্থাপন করা হয়েছে এবং ক্যাম্পাসের দৈনন্দিন কার্যক্রম ও শ্রেণিকক্ষের পাঠদান বিইউপির কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল রুম থেকে সার্ভিলেন্স সিস্টেম ও ওয়্যারলেস ফোনের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ ও সমগ্র ক্যাম্পাসের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়। ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডের মাধ্যমে বিইউপির গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম সার্বক্ষণিক প্রদর্শিত হচ্ছে। অতি সম্প্রতি বিইউপি মোবাইল অ্যাপস্ তৈরি করা হয়েছে। উক্ত অ্যাপস্ বিইউপি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত সকল তথ্য সন্নিবেশন করা আছে। অ্যাপস্ ব্যবহার করে সকলেই বিইউপির ওয়েবসাইটে প্রকাশিত সকল তথ্য সম্পর্কে জ্ঞাত হতে পারবে। সকল তথ্য বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন ও সফটওয়্যারের মাধ্যমে বিইউপির কেন্দ্রীয় ডাটা সেন্টারে সুরক্ষিত থাকে। বর্তমানে বিইউপির ডাটা সেন্টার টায়ার-৪ লেভেলে উন্নীতকরণের পরিকল্পনা চলমান আছে।

লাইব্রেরি অ্যান্ড আর্কাইভ : বিইউপির লাইব্রেরিটি পাঠপোকরণ সমৃদ্ধ। 'রূপকল্প ২০৩০' বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে এ লাইব্রেরিকে ধারাবাহিকভাবে সমৃদ্ধ করা হচ্ছে। ছাত্রছাত্রীদের মাঝে ডিজিটাল লাইব্রেরির ব্যবহার অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক। বর্তমানে Emerlad, JSTOR, ACM, Cambridge University Press, McGraw-Hill, Oxford Scholarship, Pearson, Sage, Springer, Taylor and Francis ebooks (for Social Science ebooks), Taylor and Francis ebooks (for Science & Technology ebooks), World Scientific এর মতো আন্তর্জাতিক মানের পাবলিকেশনগুলোর সাথে নিয়মানুযায়ী অধ্যয়ন অনুমতি রয়েছে। সম্প্রতি লাইব্রেরিতে Radio Frequency Identification (RFID) ভিত্তিক লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু করা হয়েছে।

স্কলারশিপ ও স্টাইপেন্ড : মেধাচর্চা ও বিকাশের উদ্যোগ হিসেবে এবং দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া অব্যাহত রাখতে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন স্কলারশিপ ও স্টাইপেন্ড চালু রয়েছে। বিগত বছরগুলোতে এ বিশ্ববিদ্যালয় এবং অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্রছাত্রীকে মেধাভিত্তিক স্কলারশিপ ও স্টাইপেন্ড প্রদান করা হয়েছে। চ্যান্সেলরস মেরিট স্কলারশিপ, চ্যান্সেলরস গোল্ড মেডেল ও ভাইস চ্যান্সেলরস স্টাইপেন্ড এর পাশাপাশি সেনাবাহিনী প্রধান, নৌবাহিনী প্রধান ও বিমানবাহিনী প্রধান স্কলারশিপ ও স্টাইপেন্ড প্রদানের প্রচলনসহ অন্যান্য স্কলারশিপ প্রদান করা হয়ে থাকে।

যুগোপযোগী কার্যক্রম : বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম, পূর্ব প্রণয়নকৃত সেমিস্টার আউটলাইন (যা বিইউপিতে গ্রিনবুক হিসেবে পরিচিত) অনুযায়ী কঠোরভাবে পরিচালিত হয়। ফলে একটি ক্লাসও না নেওয়ার বা বাতিল হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদানের গুনগতমান, ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি শ্রেণিকক্ষগুলোর সার্বিক পরিস্থিতি, সর্বোপরি শিক্ষাগত উৎকর্ষ অর্জনের অনুকূল পরিবেশ বজায় আছে কিনা এ সংক্রান্ত বিষয় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করার উদ্দেশ্যে অফিস অব দ্য ইভ্যালুয়েশন, ফ্যাকাল্টি অ্যান্ড কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট (ওইএফসিডি) হতে নিয়মিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পাঠ্য বিষয়সমূহ যুগোপযোগী করার জন্য এই অফিস সদা কাজ করে চলছে। ওইএফসিডি হতে শিক্ষকদের শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের কৌশলগত দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়াও শিক্ষকদের যথাযথ মূল্যায়ন এবং সেই সাথে বিইউপির পাঠ্যক্রমসমূহের মূল্যায়ন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধনের জন্য এই বিশেষায়িত অফিসটি কাজ করে যাচ্ছে। বিইউপির পাঠদান ও ছাত্রশিক্ষক কথপোকথন ইংরেজি ভাষায় হয়ে থাকে। ইংরেজি চর্চায় শানিত একজন শিক্ষার্থী অতি সহজেই জাতীয়, বহুজাতিক ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে নিজেকে মানসম্মত ও কার্যকরভাবে বিকশিত করতে সক্ষম। সেজন্য বিইউপির শিক্ষা কার্যক্রম, তৎসংশ্লিষ্ট শ্রেণিকক্ষের কথপোকথন, প্রেজেন্টেশন, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ এবং সংশ্লিষ্ট সহশিক্ষা কার্যক্রম ইংরেজি ভাষায় পরিচালিত হয়ে থাকে। বিইউপির শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে সকল ক্ষেত্রেই ইংরেজিতে কথপোকথনে উৎসাহিত করা হয়ে থাকে। বিইউপির শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের দক্ষতা ও সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন গ্রামীণফোন, সাইরা ফার্মেসি, জাপান, বেক্সিকো টেক্সটাইল, চীনের ইউনিভার্সিটি অব ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস অ্যান্ড ইকোনমিক্স, সাইপ্রাসের নিয়ার

ইস্ট ইউনিভার্সিটি ইত্যাদির সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীদের দূরদূরান্ত থেকে আনয়নের জন্য নিজস্ব বাস সার্ভিস চালু রয়েছে।

উচ্চশিক্ষা কার্যক্রম : সেন্টার ফর হায়ার স্টাডিজ অ্যান্ড রিসার্চ এর অধীনে বিইউপিতে উচ্চশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এমফিল ও পিএইচডি কোর্সে বাংলাদেশি গবেষকদের পাশাপাশি বিদেশি শিক্ষার্থীও রয়েছে। গবেষণা কার্যক্রমকে উৎসাহিত করাসহ অনুসন্ধিৎসু গবেষকদেরকে অনুপ্রাণিত করতে এ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক রিসার্চ গ্র্যান্টসহ সংশ্লিষ্ট সার্বিক সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে।

শিক্ষার্থীদের সাফল্য : বিইউপি শিক্ষার্থীরা জাতীয় পরিমন্ডলের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলেও একের পর এক সাফল্যের স্বাক্ষর রেখে চলেছেন। গত ১ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত UNILEVER BIZMAESTROS 2018 এ বিইউপি শিক্ষার্থীরা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। বিইউপির ফাইন্যান্স বিভাগের ছাত্র জুবায়ের বিন আলম থাইল্যান্ডের ব্যাংককে অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ৩য় স্থান অর্জন করেন। উক্ত প্রতিযোগিতায় ২০টি দেশের ৮০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। বিইউপির বিজনেস অনুষদের ফাইন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের চার শিক্ষার্থী গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে ভারতের মনিপালে অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন এবং বেস্ট পেপার অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেন। সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের ৫০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। গত ০৬ মে ২০১৮ তারিখে বিইউপির বিবিএ-জেনারেল ২০১৫ ব্যাচ এর তিন শিক্ষার্থী জুবায়ের বিন আলম, নেওয়াজ মোঃ রাকিন ও সাইফ সোহান সৈকত রেডিসন ব্লু ঢাকা ওয়াটার গার্ডেনে অনুষ্ঠিত 'Battle of Mind'18 চূড়ান্ত পর্বে প্রথম রানার আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। বৃটিশ অ্যামেরিকান টোবাকো বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১১০০ এর বেশি দল অংশগ্রহণ করে। গত ২৪ ও ২৫ জুন ২০১৮ তারিখে সুইজারল্যান্ডের জুরিখে অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বিইউপির শিক্ষার্থী চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। নেদারল্যান্ড ও জার্মানসহ মোট ছয়টি দল ফাইনালে অংশগ্রহণ করেন। গত ২৪ জুলাই ২০১৮ তারিখে বিইউপির বিবিএ (জেনারেল) এর শিক্ষার্থী সৈয়দ মাসাদ মাহমুদ ফ্যাকাল্টিতে সর্বোচ্চ রেজাল্ট করায় ইউজিসি থেকে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। গত ১০ জুলাই ২০১৭ তারিখে নেপালে অনুষ্ঠিত বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বিইউপি লিটারেচার অ্যান্ড ডিবেট ক্লাব এর ৯ সদস্যের একটি দল রানার্স আপ হওয়ার গৌবর অর্জন করেন।

প্রায়োগিক জ্ঞান : বিইউপিতে শিক্ষার্থীদের তাত্ত্বিক বিষয়ে পাঠদানের পাশাপাশি প্রায়োগিক বিষয়েও পাঠদানে গুরুত্বারোপ করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় শিক্ষার্থীরা তাত্ত্বিক জ্ঞানের চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে বছরজুড়ে বিভিন্ন প্রায়োগিক জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে নিজেদের নিয়োজিত রাখেন। যেমন, বিভিন্ন কোম্পানি পরিদর্শন, গার্মেন্টস, ঐতিহাসিক স্থাপনা পরিদর্শন ইত্যাদি। গত ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থীরা বগুড়ায় অবস্থিত রুরাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাকাডেমি পরিদর্শন করেন। শিক্ষার্থীদের কোর্সের সাথে উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত থাকায় এই শিক্ষাসফরের আয়োজন করা হয়। গত ৩১ জুলাই ২০১৮ তারিখে ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থীরা ঢাকার শ্যামলীতে অবস্থিত শিশুপল্লী পরিদর্শন করেন। গত ০৩ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে বিবিএ-জেনারেল প্রোগ্রামের বিবিএ-২০১৮ ব্যাচের শিক্ষার্থীরা কাশিমপুর গাজীপুরে অবস্থিত ডিবিএল গ্রুপ ভিজিট করেন। গত ১২ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের ২০১৫ ও ২০১৬ ব্যাচের শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পিস সাপোর্ট অপারেশন ট্রেইনিং (বিপসট) পরিদর্শন করেন, যাতে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের বাস্তবিক জ্ঞান সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার পাশাপাশি বেসামরিক লোকজনের সুরক্ষা, সামরিক ও বেসামরিক লোকজনের পারস্পারিক সহযোগিতা, মানবিক সাহায্য, আন্তর্জাতিক মানবিক আইন, জেন্ডার বিষয়সহ অন্যান্য বিষয়ে ধারণা পেয়ে থাকে। গত ১৮ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে বিবিএ-জেনারেল প্রোগ্রামের বিবিএ-২০১৭ ব্যাচের শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি ভিজিট করেন। গত ০৩-০৬ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের তত্ত্বাবধানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থীরা কক্সবাজারে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের ফলে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, পরিবেশ, রাজনৈতিক ও আঞ্চলিক প্রভাব এবং অন্যান্য সমস্যাসমূহ পর্যালোচনার লক্ষ্যে কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলা সরেজমিনে পরিদর্শন করেন।

উপসংহার : বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্ এ আধুনিক পাঠ্যোপকরণ, সময়োপযোগী পাঠদান, সুশৃঙ্খল পরিবেশ ইত্যাদি বিদ্যমান। ফলে শিক্ষার্থীরা সুন্দর ও মনোরম পরিবেশে তাদের শিক্ষাকার্যক্রম সময়মত শেষ করার সুযোগ পেয়ে থাকে। এছাড়া বাস্তবিক জ্ঞান অর্জন করার জন্য বছরজুড়ে ফিল্ড ভিজিট, ইন্ডাস্ট্রি ভিজিটসহ নানা ধরনের ভিজিট সম্পন্ন করে থাকে। ইতোমধ্যেই বিইউপির শিক্ষার্থীদের প্রতিনিয়ত সাফল্য দেশে ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে ছড়িয়ে পড়েছে।

বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে প্রশাসনিক সংস্কার (১৯৭২-৭৫) : একটি মূল্যায়ন

প্রফেসর এম আবুল কাশেম মজুমদার, পিএইচডি
উপ-উপাচার্য

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার হতে মুক্ত হয়ে ১৯৭২ সালে ১০ই জানুয়ারি দেশে প্রত্যাবর্তন করেই তাঁর দ্বিতীয় সংগ্রাম শুরু করেন যা ছিল বাংলাদেশকে "সোনার বাংলায়" রূপান্তরিত করা। এ সংগ্রাম যে কোনো মাপকাঠির মূল্যায়নে ছিল কঠিন এবং এতে বিজয় লাভ ছিল অনেকটা দুঃসাধ্য। এর কারণ হলো সে সময়ে বিদ্যমান ছিল দেশের ভিতর ও বাইরে অসংখ্য প্রতিকূলতা। শূন্য থেকে শুরু করে তাঁর সরকারকে যুদ্ধ বিধ্বস্ত একটি দেশের অগণিত সমস্যা মোকাবিলা করতে হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে গুরুত্বপূর্ণ সকল ক্ষেত্রে রাষ্ট্র এবং জাতিগঠন কার্যক্রম শুরু হয়। আইন শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার, মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন, যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনর্নির্মাণ, মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীদের জনরোষ থেকে রক্ষা করা ও মানবাধিকার সুনিশ্চিত করাসহ লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত মানুষের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করা এবং এ ধরনের আরও অনেক সমস্যার সমাধান তাঁর সরকারের সামনে কঠিন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলার উদ্দেশ্যে স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে বিদ্যমান সরকারি কাঠামো এবং এর কাজের প্রকৃতি ঢেলে সাজানো বা পুনর্গঠনের লক্ষ্যে সরকারি উদ্যোগ হিসেবে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বেশকিছু প্রশাসনিক সংস্কার গৃহীত হয়।

এতদুদ্দেশ্যে যে দুটি প্রধান কমিটি গঠন করা হয় সেগুলো হলো প্রশাসনিক ও চাকরি পুনর্বিন্যাস কমিটি-১৯৭২ এবং জাতীয় বেতন কমিশন-১৯৭৩। এই দুটি কমিটি বা কমিশনকে স্থানীয় সরকারসহ কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্রের পুনর্গঠন, কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে স্থানীয় পর্যায়ে ক্ষমতার বিবর্তন এবং একটি জাতীয় বেতন কাঠামো সম্পর্কে প্রস্তাব পেশ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়।

১৯৭২ সালের ১৫ই মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য এবং বাংলাদেশে লোক প্রশাসন অধ্যয়নের পথিকৃৎ ড. মোজাফফর আহমেদ চৌধুরীর নেতৃত্বে চার সদস্যবিশিষ্ট প্রশাসনিক ও চাকরি পুনর্বিন্যাস কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটিতে বাকি তিনজন সদস্য ছিলেন একজন অর্থনীতিবিদ, একজন সংসদ সদস্য এবং একজন সি.এস.পি কর্মকর্তা যথাক্রমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক আনিসুর রহমান, সংসদ-সদস্য মাহবুবুজ্জামান ও ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম। এ কমিটির গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ বা অনুসন্ধানের বিষয়াবলির মধ্যে ছিল-

প্রথমত : ভবিষ্যৎ কাঠামো নির্ধারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন সার্ভিসের বিদ্যমান কাঠামো পরীক্ষা করে যুগোপযোগী ও প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করা।

দ্বিতীয়ত : শিক্ষা ও কাজের চাহিদার মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি করা এ কমিটির আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধানের বিষয় ছিল।

তৃতীয়ত : স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জন আকাঙ্ক্ষার পরিপূরক হিসেবে বিদ্যমান প্রশাসনিক ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজনে একটি সার্বিক ও সমন্বিত পরিকল্পনা তৈরি করা ও এর সমন্বয় সাধন করা ছিল এ কমিটির অন্যতম দায়িত্ব।

এ কমিটি ১৩ জন মন্ত্রী ও ৭৫ জন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা ছাড়াও ১৮৩টি প্রশাসনিক সংগঠনের কাছ থেকে মতামত গ্রহণ করে। দেশের অভ্যন্তরে চট্টগ্রাম ও রাজশাহী জেলা সদর থেকে তথ্য সংগ্রহ করার পাশাপাশি সামাজিক সুবিচার ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ভিত্তি রচনার উদ্দেশ্যে এ কমিটি সোভিয়েত রাশিয়াসহ বিশ্বের আরও কয়েকটি দেশে ভ্রমণ করেছিল। প্রশাসনিক ও চাকরি পুনর্বিন্যাস কমিটির সুপারিশমালার মধ্যে ছিল :

১. এ কমিটির অন্যতম সুপারিশ ছিল প্রশাসনিক ব্যবস্থায় এলিট ক্যাডারের বিলোপ সাধন। ব্যাপক আলোচনা পর্যালোচনার ভিত্তিতে কমিটি মতামত প্রদান করে যে, যতদিন পর্যন্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থা থেকে এলিট ক্যাডারদের বিলোপ সাধন না হবে ততদিন প্রশাসনিক ব্যবস্থা গতিশীলতা বা উন্নতি লাভ করতে সক্ষম হবে না। কমিটি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করে যে, দেশের সার্বিক প্রয়োজনে সরকার কর্তৃক গৃহীত নীতিমালা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য একটি শ্রেণিহীন সুসমন্বিত চাকুরী কাঠামোর বিকল্প থাকতে পারে না।

২. কমিটি ঔপনিবেশিক আমলের মন-মানসিকতায় গঠিত সিভিল সার্ভিস প্রথায় গেজেটেড ও নন-গেজেটেড পদমর্যাদা বাতিলের পাশাপাশি শ্রেণিবিভাজন ভিত্তিক প্রথম শ্রেণি, দ্বিতীয় শ্রেণি, তৃতীয় শ্রেণি ইত্যাদি রহিতকরণের পাশাপাশি শুধুমাত্র

একটি একক বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস রূপান্তরের মাধ্যমে সমগ্র প্রশাসনের দায়িত্ব এই একক সার্ভিসকে প্রদান করার সুপারিশ করে। এতে প্রশাসনে বিদ্যমান গেজেটেড ও নন-গেজেটেড, সিভিল সার্ভিস প্রশাসন, সিভিল সার্ভিস পুলিশ, সিভিল সার্ভিস শিক্ষা ইত্যাদি স্বকীয় সত্তামূলক সার্ভিসসমূহ নিরসনের মাধ্যমে সার্ভিসে বৈষম্যমূলক পদমর্যাদা সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব নিরসন করা সম্ভব হবে যার ফলে প্রশাসনে গতিশীলতা সৃষ্টি হবে।

৩. জেলা, থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে নির্বাচিত স্থানীয় সরকারের নিকট পর্যাপ্ত পরিমাণ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব হস্তান্তরের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে স্ব-শাসিত শাসন ব্যবস্থায় রূপান্তরের পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি মহকুমাকে জেলায় উন্নীতকরণ করাসহ প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে বিভাগকে বিলুপ্ত করার সুপারিশও কমিটি প্রদান করে। এর মাধ্যমে সাধারণ জনগণের দ্বারপ্রান্তে যথাসময়ে যথার্থ পরিমাণে সরকারি সেবাদি পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে।

৪. এই কমিটি মেধা ও জ্যেষ্ঠতাকে প্রাধান্য দিয়ে পরীক্ষা ও সার্ভিস রেকর্ডের ভিত্তিতে বাছাইকৃত সিনিয়র আমলাদের সমন্বয়ে একটি নীতি ও ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনের সুপারিশ করে। জাতীয় বেতন স্কেলের তৃতীয় গ্রেড হতে প্রথম গ্রেড পর্যন্ত সকল পদ এ কমিটির অন্তর্ভুক্ত হবে এবং এ কমিটি সরকারের যাবতীয় নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রণয়নে সরকারকে সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি গৃহীত নীতিমালা ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট আমলাদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করবে।

৫. আমলাতান্ত্রিক জটিলতা বিলুপ্তির লক্ষ্যে একটি শ্রেণিহীন, বর্ণহীন এবং সমতা ভিত্তিক চাকুরী কাঠামো প্রণয়ন এবং সে লক্ষ্যে একই সময়ে সরকার কর্তৃক গঠিত জাতীয় বেতন কমিশনকে মাত্র ১০টি গ্রেড সম্পন্ন একটি শ্রেণিহীন সমরূপ জাতীয় বেতন স্কেল নির্ধারণ করা এ কমিটির অন্যতম সুপারিশ ছিল। এর মাধ্যমে প্রশাসনিক দ্বন্দ্ব ও বিরোধ নিরসন করে প্রশাসনে সৃষ্টিশীল এবং গতিসম্পন্ন কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব বলে কমিটি মনে করে।

৬. এ কমিটির সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্তে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের একজন বিচারকের নেতৃত্বে একটি পর্যালোচনা কমিটি গঠনের সুপারিশ করা হয়।

১৯৭৩ সালের এপ্রিল ও অক্টোবর মাসে প্রশাসনিক ও চাকরি পুনর্বিন্যাস কমিটি দুই ধাপে এর প্রতিবেদন পেশ করে। প্রতিবেদনের প্রথম অংশে ছিল সরকারি চাকরি পুনর্গঠনের প্রস্তাব। একই সময়ে অর্থাৎ ১৯৭২ সালে গঠিত জাতীয় বেতন কমিশনকে ঔপনিবেশিক আমলের বৈষম্যমূলক বিদ্যমান স্কেলসমূহকে যুগোপযোগী পর্যালোচনার ভিত্তিতে একটি নতুন বেতন স্কেল নির্ধারণের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য বজায় রাখা ছিল এই পুনর্গঠন প্রস্তাবে অন্যতম উদ্দেশ্য। প্রতিবেদনের দ্বিতীয় অংশে ছিল সচিবালয় পদ্ধতি ও কার্যপ্রণালি, মন্ত্রণালয় ও বিভাগীয় সংস্থা এবং জেলা ও স্থানীয় প্রশাসন পুনর্গঠন সম্পর্কিত সুপারিশ সংবলিত। বাংলাদেশের প্রশাসনিক সংস্কারের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে ড. মোজাফফর আহমেদ কমিটির প্রস্তাবনা ও সুপারিশসমূহ একটি যুগান্তকারী উদ্যোগ। এ কমিটির প্রস্তাবনা ও সুপারিশসমূহ ছিল অনন্য। কিন্তু এর প্রস্তাবনা ও সুপারিশসমূহ তৎকালীন প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে যেতে পারে এ আশঙ্কায় এগুলো বাস্তবায়নের বিষয়ে ন্যূনতম কোন পদক্ষেপও গৃহীত হয়নি। এই কমিটির বিরোধী শক্তি প্রশাসনে এতোটাই গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী ছিল যে, অত্যন্ত চাতুর্যের সাথে পর্দার আড়াল থেকে তারা বাঁধাদানে সক্ষম হন। ফলে এ কমিটির প্রতিবেদন ও সুপারিশসমূহ জনপ্রশাসনের দায়িত্বে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে ফাইলবন্ধ অবস্থায় নথিভুক্ত হয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, ড. মোজাফফর আহমেদ চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন এ কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়ন না হলেও বাংলাদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় এ কমিটির বিশেষ অবদান আছে। প্রশাসনে বিদ্যমান অতীতের এলিট ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনের পথ এ কমিটির সুপারিশ উপস্থাপনের পর বন্ধ হয়ে যায়। নাম ফলক ও পরিচয়পত্র সর্বস্ব কর্মকর্তারা তাদের ক্যাডার সংকেত উল্লেখ থেকে নিবৃত হয়। ন্যূনতম হারে হলেও ক্রমশঃ হ্রাস হতে থাকে বিশেষ সার্ভিসভুক্ত কর্মকর্তাদের জন্য সংরক্ষিত পদের সংখ্যা। এমনতর অবস্থায় বলা যায় যে, প্রশাসনিক ও চাকরির পুনর্বিন্যাস কমিটির সুপারিশের সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া বাংলাদেশের প্রশাসনিক ইতিহাসে প্রচ্ছন্নভাবে হলেও পরিলক্ষিত হয় ।

প্রশাসনিক ও চাকুরি পুনর্বিন্যাস কমিটির ধারাবাহিকতায় ১৯৭২ সালের ২১ জুলাই প্রাক্তন সচিব আব্দুর রবের নেতৃত্বে ১০ সদস্য বিশিষ্ট (৫ জন পূর্ণ সদস্য ও ৫ জন অন্তর্বর্তীকালীন সদস্যের) বেতন ও চাকরি কমিশন গঠন করা হয়। এ কমিশন বাংলাদেশের প্রশাসনিক ইতিহাসে প্রথম জাতীয় বেতন কমিশন নামে পরিচিত। এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল একটি বৈষম্যহীন ও সময়োপযোগী বেতন কাঠামো প্রবর্তন করা, যার মাধ্যমে সরকারি চাকুরিতে মেধাবী ও যোগ্য ব্যক্তিদেরকে নিয়োগ এবং পরবর্তীতে নিয়োজিত

রাখা সম্ভব হয়। এই কমিশন মোজাফফর কমিটির সাথে পরামর্শক্রমে প্রশাসনিক সংস্কারের আলোকে জাতীয় বেতন স্কেল ও গ্রেড সম্পর্কে সুপারিশ প্রদান করার দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়।

স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের সংবিধানে একটি শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থা কায়েমের লক্ষ্যে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে সমাজতন্ত্র সংযুক্ত হবার প্রেক্ষাপটে কমিশন সরকারি খাতে নিযুক্ত ও কর্মরত সকল কর্মকর্তা কর্মচারীর বিদ্যমান বেতন কাঠামো পর্যালোচনা করে জাতীয় পর্যায়ে নতুন এক বেতন কাঠামো প্রবর্তনের জন্য সুপারিশ করে। কমিশনের সুপারিশকৃত এই বেতন কাঠামোর আওতায় ছিলো শিল্প কলকারখানায় নিয়োজিত শ্রমিক ব্যতীত সকল সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত ও আধা-স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দসহ প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যবৃন্দ।

সাধারণভাবে সংজ্ঞায়িত পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের জীবনযাত্রার জন্য সর্বনিম্ন ব্যয় নির্ধারণ, সরকারি চাকুরিতে নিয়োজিত উচ্চতম ও নিম্নতম কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতনের ক্ষেত্রে বৈষম্য সহনীয় পর্যায়ে হ্রাস করা, সরকারের আর্থিক সংগতির সাথে সংগতি বিধান, সরকারি খাতে যোগ্যতম ব্যক্তিদের আকৃষ্ট করা, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি বিবেচনায় রেখে জাতীয় বেতনের স্কেল নির্ধারণ বিষয়ে সুপারিশ করা হয়। ১০ সদস্যবিশিষ্ট এ কমিশন সমাজের বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও বুদ্ধিজীবীদের সাথে আলোচনা করার পাশাপাশি সোভিয়েত রাশিয়া ও ভারতসহ কয়েকটি সমাজতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বেতন কাঠামো পর্যালোচনা করে। কমিশন কমপক্ষে ১০০টি অধিবেশনে মিলিত হয়ে বেশকিছু সুপারিশ পেশ করে। নিম্নে কমিশনের সুপারিশসমূহ আলোচনা করা হলো :

১। জাতীয় বেতন কমিশন স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে বিদ্যমান ২,২০০-এর অধিক বেতন স্কেল বাতিল করে নতুন ১০টি স্কেল প্রবর্তনের সুপারিশ করে। নতুন দশটি স্কেলে সর্বনিম্ন মূল বেতন ১৩০ টাকা ও সর্বোচ্চ মূল বেতন ২,০০০ টাকা নির্ধারিত হয়, যার আনুপাতিক হার হলো ১ ঃ ১৫.৩৮। উল্লেখ্য যে, পূর্বেকার বাতিলকৃত বেতন স্কেলে এ আনুপাতিক হার কয়েকগুণ বেশি ছিলো। সর্বনিম্ন বেতন নির্ধারণের ক্ষেত্রে কমিশন তিন সন্তানসহ স্বামী-স্ত্রীকে পরিবার হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে এবং কমিশনের বিবেচনায় এই সর্বনিম্ন মূল বেতনের মাধ্যমে জীবনমানের ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব বলে প্রতীয়মান।

২। কমিশন মনে করে যে, বেতনের স্কেল নির্ধারণ কোনো চূড়ান্ত ব্যবস্থা নয়, বরং এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। তাই অর্থনৈতিক অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষের মৌলিক চাহিদার ভিত্তিতে জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহে মূল্য বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে বেতন কাঠামোতে পরিবর্তন সাধন করা যুক্তিসংগত। এ যুক্তির ভিত্তিতে কমিশন ১০টি বেতন স্কেল নির্ধারণসহ সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ মূল বেতনের স্কেল নির্ধারণে যে পরিবর্তিত বেতন কাঠামো ব্যবস্থার সুপারিশ করে তা স্বাধীন বাংলাদেশে গৃহীত প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাথে যেমন সংগতিপূর্ণ ছিলো তেমনি একই সময়ে গঠিত প্রশাসন ও চাকুরি পুণর্বিন্যাস কমিটির সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিলো।

৩। কর্মকর্তা ব্যবস্থাপনা ও সুপারিশকৃত নতুন বেতন ব্যবস্থাকে কার্যকর করার লক্ষ্যে এ কমিশন কর্মকর্তা ও বেতন প্রশাসন মন্ত্রণালয় নামক একটি নতুন মন্ত্রণালয় গঠনের সুপারিশ করে। সরকারি খাতে নিয়োজিত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতন কাঠামো ও বেতন সম্পর্কিত বিষয়াদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনাসহ যদি কোনো বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দেয় তার সুষ্ঠু সমাধান নিশ্চয়তা বিধানে এ মন্ত্রণালয় কার্যকর ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে বলে কমিশন আশা পোষণ করে। এছাড়াও কমিশন মনে করে যে, এ ধরনের একটি মন্ত্রণালয় স্থায়ী বেতন কমিশনের বিকল্প হিসেবে কাজ করবে।

৪। সরকারি কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন নির্ধারণের ক্ষেত্রে দেশের প্রচলিত আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করার বিষয়ে কমিশন জোরালো সুপারিশ প্রদান করে। বাঙালি জাতীয়তাবাদ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের তৎকালীন রাষ্ট্র দর্শনকে বিবেচনা করে কমিশন নতুন বেতন কাঠামো ও আনুষঙ্গিক সুপারিশসমূহ প্রণয়ন করে বলে কমিশন দাবি করে।

৫। সরকারকে রাষ্ট্রে আদর্শ ও নৈতিক ভূমিকা পালনের উদ্দেশ্যে সমপর্যায়ের কাজের জন্য সমপর্যায়ের বেতনের নীতি অনুসরণ করার বিষয়ে কমিশন সুপারিশ করে। অর্থাৎ বর্ণ, গোত্র ও লিঙ্গ ইত্যাদি বিবেচনায় না রেখে একটি ধনাত্মক কার্যক্রমকে বিবেচনায় রেখে একই প্রকার যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার আলোকে একই কাজের বিনিময়ে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ একই বেতন কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত হবেন বলে কমিশন আশাবাদ ব্যক্ত করে এবং নতুন বেতন কাঠামো সুপারিশের ক্ষেত্রে সে আশার প্রতিফলনও ঘটেছে বলে কমিশন দাবি করে।

৬। জাতীয় বেতন কমিশন সরকারি কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য জাতীয় স্বাস্থ্য বিমা চালু করার সুপারিশ করে। যুদ্ধ বিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনর্গঠনকে সরকারের ব্যাপক ব্যয় নির্বাহ করার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে প্রাথমিক পর্যায়ে এ ব্যবস্থা শুধু বড় বড় শহরে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য প্রচলন করার বিষয়ে সুপারিশ করা হয়।

৭। পেশাগত উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে এ কমিশন ভিন্ন ভিন্ন পেশার ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন বেতন কাঠামো বিবেচনা করার সুপারিশ করে, যেমন : শিল্পী, সংগীতজ্ঞসহ প্রাথমিক স্কুল শিক্ষকদের বেতন ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করতে হবে বলে মত প্রকাশ করা হয়। এই সুপারিশ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোনো পেশায় নিয়োজিত চাকুরীরতদের বেতন কমে গেলে সেক্ষেত্রে পরবর্তী উচ্চতর স্কেলে তাদের স্থাপিত করার বিষয়েও কমিশন সুপারিশ করে।

একটি বাস্তবসম্মত বেতন নীতিমালা প্রণয়নের জন্য কমিশন বিভিন্ন পরিবর্তনশীল বিষয় যেমন- জীবনযাত্রার ব্যয়, সরকারি সম্পদ, বিদ্যমান বেতন বৈষম্য, বিশেষজ্ঞদের সরকারি চাকুরিতে ধরে রাখার জন্য আকর্ষণীয় সুবিধা দান ও দক্ষতা অর্জন, সমতা এবং কর্ম উৎসাহ সম্পর্কে গবেষণা করে স্কেল প্রদানের সুপারিশসহ চাকুরি সংক্রান্ত অপরাপর কিছু বিষয়ে (যেমন-ঐতিহাসিকভাবে বিদ্যমান সাধারণী - বিশেষজ্ঞ দ্বন্দ্ব নিরসনে প্রশাসনিক ও চাকুরি পুনর্বিন্যাস কমিটির সাথে একাত্মতা প্রকাশ) মূল্যবান মতামত প্রদান করে। কমিশন প্রথমে নয় স্কেল বিশিষ্ট একটি বেতন কাঠামোর কথা চিন্তা ভাবনা করলেও পরবর্তীতে দশ স্তর বিশিষ্ট বেতন স্কেলের সুপারিশ প্রদান করে। মূলতঃ এই সুপারিশমালাও আংশিকভাবে বাস্তবায়ন করা হয় এবং তা মাত্র তিন বছর অব্যাহত ছিল। কমিশনের সুপারিশ পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়িত না হওয়ার পেছনে অন্যতম কারণ হিসেবে পর্যবেক্ষকমহল সাধারণ শ্রেণিভুক্ত প্রাক্তন সি.এস.পি ও ই.পি.সি.এস ক্যাডার ও এর উত্তরসূরী সিভিল সার্ভেন্টদের চরম বিরোধিতাকেই দায়ী করে থাকে। এছাড়াও যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে রাজনৈতিক সরকারের অনভিজ্ঞতা ও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ঔপনিবেশিক আমলের আমলাতান্ত্রিক জটিলতাকে দূরীকরণে সরকারের গৃহীত কিছু পদক্ষেপ যথার্থভাবে কার্যকর করার ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক গড়িমসিকে কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে থাকে।

স্বাধীনতা পরবর্তী যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের তৎকালীন প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধু সরকারের প্রশাসনিক সংস্কারের ক্ষেত্রে এ দুটি কমিটি ছাড়াও অপর একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ছিল ১৯৭২ সালে গৃহীত রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ নং ৯। নয় মাস ব্যাপী মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সংখ্যায় যদিও অতি নগন্য কিন্তু সংগঠিত স্বৈরাচারী পাকিস্তানি মনোভাবাপন্ন এবং মৌলবাদী চিন্তাভাবনায় উজ্জীবিত একটি গোষ্ঠী প্রবাসী সরকারের বিরোধিতা করাসহ স্বাধীনতার পরিপন্থি কার্যক্রমে লিপ্ত ছিল। প্রশাসনে এই গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বকারী কিছু সংখ্যক আমলা পাকিস্তান সরকারের দালাল হিসেবে সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও মুক্তিযুদ্ধে বিশ্বাসী সরকারকে সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। এদেরই কেউ কেউ সরকারে জেঁকে বসে থেকে সরকারের পুনর্গঠন কাজে গোপনে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে এমন ধারণায় অনুপ্রাণিত হয়ে এবং রাজনৈতিক সরকারের নিকট আমলাতন্ত্রকে যথার্থভাবে জবাবদিহি করার অভিপ্রায়ে এ আদেশ জারি করা হয়। রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ নং ৯ এর ঘোষণা অনুসারে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি দেশের "বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে" কোনো কারণ উল্লেখ না করে কোনো সরকারি কর্মচারীকে কর্মরত পদ থেকে পদচ্যুত, পদাবনতি এবং অপসারণ করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। এ অধ্যাদেশ কার্যকর হবার পর শাসনব্যবস্থায় নিয়োজিত সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে বিশেষত পাকিস্তানি ধ্যান-ধারণায় অনুপ্রাণিত আমলাদের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। তাদের কেউ কেউ এই অধ্যাদেশের বিপক্ষে বেশ কিছু সমালোচনা উত্থাপিত করে যেমন এই অধ্যাদেশের ফলে সরকারি কর্মচারীদের সৃজনশীলতা বিনষ্ট হবে, সরকারি কার্যক্রমে কর্মচারীদের অনাগ্রহ দেখা দিবে এবং স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ বিনষ্ট হবে। সমালোচকগণ এই অধ্যাদেশকে অগণতান্ত্রিক ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের শামিল বলে মনে করে এ অধ্যাদেশকে কালো আইন বলেও আখ্যায়িত করেন। আদালত কর্তৃক প্রদত্ত কোনো আইনি প্রতিকারের অধিকার না থাকলেও এবং ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ নং ৯ গৃহীত হবার পর এর বিপক্ষে সমালোচনা সৃষ্টি হলেও তৎকালীন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধু সরকার এই কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হন। এর মাধ্যমে কতিপয় আমলাকে চাকুরিচ্যুতও করা হয়। ১৯৭২-৭৪ সময়কালে স্বাধীনতাযুদ্ধে বিধ্বস্ত প্রশাসনিক অবকাঠামো পুনর্গঠন, বিধ্বস্ত যোগাযোগ অবকাঠামো পুনর্গঠন, পরপর চার বছরের ফসলহানি (১৯৭১ সনে স্বাধীনতাযুদ্ধের কারণে, ১৯৭২, ১৯৭৩ ও ১৯৭৪ সনের প্রলয়ঙ্করী বন্যার কারণে), আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের মূল্যবৃদ্ধি (১৯৭১ সনে ব্যারেল প্রতি ৭ মার্কিন ডলার থেকে ১৯৭৩ সনের আরব ইসরায়েল যুদ্ধে প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে ওপেক গঠন বছরের মাঝামাঝি সময়ে প্রতি ব্যারেল অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম তেলের দাম ৪৩ মার্কিন ডলারে উঠে যাওয়া), এক বছরের মধ্যে মুদ্রা বিনিময়হার ডলার প্রতি ৪.৭৬ টাকা থেকে ১৩ টাকা এমনকি ১৫ টাকায় উঠে যাওয়া ইত্যাদি কারণে দ্রব্যমূল্য জ্যামিতিকহারে বৃদ্ধি পায় (১৯৭১ সনে চালের মূল্য মন প্রতি ৪০ টাকা থেকে অথবা স্বর্ণের মূল্য ভরি প্রতি ১৫০ টাকা থেকে

১৯৭৩ সনের মাঝামাঝি যথাক্রমে ১২০ টাকায় ও ১৪০০ টাকায় উন্নীত হয়) যা সকল শ্রেণির জনগণের জন্য প্রচণ্ড দুঃখ-কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এমনকি দেশীয় আমলাতান্ত্রিক ষড়যন্ত্র যোগসাজসে বিদেশি ষড়যন্ত্রের ফলে ১৯৭৪ সনে দেশে প্রায় দুর্ভিক্ষাবস্থা দেখা দেয়। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, তৎকালীন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগঠন ও অস্থিতিশীল আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পূর্ণাঙ্গ আমলাতান্ত্রিক সহায়তা পাবার জন্য নবগঠিত বঙ্গবন্ধু সরকারকে এ ধরনের কঠোর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর তৎকালীন স্বৈরশাসক খন্দকার মোস্তাক সর্বপ্রথম যে আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ করে তা ছিলো অধ্যাদেশ ৯ এর বিলোপসাধন এবং এ হতে প্রতীয়মান হয় যে, এ আইনের বিলোপসাধনের সুবিধাভোগী কারা।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এদেশের মানুষের ন্যায্য অধিকার আদায় ও জনগণের স্বার্থ রক্ষার প্রশ্নে ছিলেন অনড়, অটল, অবিচল ও বিশ্বস্ত। দেশ-বিদেশের কোনো ষড়যন্ত্র বা শক্তি বঙ্গবন্ধুকে এ প্রশ্নে ন্যূনতম মাত্রায় কক্ষচ্যুত করতে পারেনি। বঙ্গবন্ধুর জীবন দর্শন ছিল এদেশের গণমানুষের সুখ-সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এক গভীর মানবিক সংগ্রামী দর্শন। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন দর্শনের ভিত্তি এবং শক্তি ছিল গণমানুষ। সে কারণেই মানুষের বিশেষত দুঃখী, মেহনতি মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর প্রশ্নে রাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি ছিলেন স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে আপসহীন, তা মুক্তিযুদ্ধের আগেই হোক বা মুক্তিযুদ্ধের পরেই। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলাদেশে একটি সুষম সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে উঠবে, এ রকম একটি স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য বিসর্জন দিতে হয়েছে ত্রিশ লাখ জীবন, আর লাখ নারীর সম্ভ্রম। স্বাধীনতাত্তোর দেশে সাধারণ জনগণের সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে তিনি রচনা করেন স্বদেশজাত উন্নয়ন দর্শন। তাঁর এ উন্নয়ন দর্শনের লক্ষ্য ছিল সাধারণ মানুষের জন্য রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক সুযোগ, সামাজিক সুবিধাদি, স্বচ্ছতার নিশ্চয়তা এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তা-সুরক্ষার স্বাধীনতা নিশ্চিত করা। আর এ উন্নয়ন দর্শনকে বাস্তবায়িত করার জন্য এবং স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে অসংখ্য মানুষের স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্বাধীন দেশে জনকল্যাণমুখী, সমাজবান্ধব, জবাবদিহিমূলক, দুর্নীতিমুক্ত একটি জনপ্রশাসন ব্যবস্থা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

দীর্ঘ ৪৭ বছরে সরকার পরিচালনায় পরিবর্তন এসেছে, রাষ্ট্রব্যবস্থায় পরিবর্তন এসেছে, এমনকি ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে জনগণের ধ্যান-ধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তা ভাবনায়। ফলে পরিবর্তিত সময়ের সাথে সংগতি রেখে, জনগণের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত ১৮ বার প্রশাসনিক সংস্কার সাধনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যদিও এসব গৃহীত প্রশাসনিক সংস্কারের লক্ষ্য ছিল সমগ্র রাষ্ট্রের গতিশীলতা সৃষ্টি করা, জনগণের সামগ্রিক কল্যাণ সাধন করা তথাপি তা পূর্ণাঙ্গভাবে কার্যকর হয়নি। স্বাধীনতার পর এত দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হলেও এখনও আমরা ঔপনিবেশিক ধ্যান-ধারণায় গড়া প্রশাসন থেকে মুক্ত হতে পারিনি। বর্তমানে নব্য প্রশাসনিক ব্যবস্থার যুগে সময় এসেছে প্রচলিত ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-ভাবনার গণ্ডি থেকে বেরিয়ে এসে বড় ধরনের পরিবর্তনের এবং আমূল প্রশাসনিক সংস্কারের। প্রশাসনে সংকীর্ণতার গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকা, ভেদাভেদ আর ক্ষুদ্র দলীয়, গোষ্ঠীগত ও আঞ্চলিকতার বিভাজন দূর করে উদার অভ্যুদয়েরও সময় এসেছে ।

বস্তুত বঙ্গবন্ধুই ছিলেন স্বাধীন সার্বভৌম সোনার বাংলাদেশের প্রকৃত স্বপ্নদ্রষ্টা। বঙ্গবন্ধু বাঙালির দুঃখ-কষ্টকে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। বাঙালি জাতিকে শোষণমুক্তির সংগ্রামের ডাক দিয়েছিলেন। যে ডাক বঙ্গবন্ধুর মতো করে আর কেউ কখনো দিতে পারেনি; এমনকি জাতীয় চেতনায় সকলকে ঐক্যবদ্ধ করাও অদ্যাবধি সম্ভব হয়নি। বঙ্গবন্ধুর এ উদাত্ত আহ্বানের লক্ষ্য ছিল একটিই আর তা হলো একটি সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গঠন। বঙ্গবন্ধু শুধু বাংলাদেশের স্বাধীনতাই চাননি, এদেশের মানুষের সার্বিক মুক্তিও চেয়েছেন; একটি সমৃদ্ধশালী স্বনির্ভর বাংলাদেশও কামনা করেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গঠনে তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। তিনি সামগ্রিকভাবে প্রশাসনকে পুনর্গঠিত করে প্রশাসনযন্ত্রকে জনসেবায় নিবেদিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এ উদ্দেশ্যে সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশের জন্য একটি সুদৃঢ় প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু একটি আধুনিক ও শক্তিশালী আমলাতন্ত্র গঠনের সকল পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তাঁর শাসনামলে (১৯৭২-৭৫) গঠিত দুটি প্রশাসনিক সংস্কারের মাধ্যমে। তাঁর প্রশাসনিক সংস্কার কর্মসূচির মূলে একটি সত্যই প্রতিভাত ছিল, আর তা হচ্ছে আত্মনির্ভরশীল একটি জাতি তথা সর্বক্ষেত্রে স্বনির্ভর বাংলাদেশ গঠন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের মাঝে না থাকলেও স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ার জন্য তাঁর প্রদর্শিত পথ ও আদর্শ আজও আমাদের জন্য আলোকবর্তিকা স্বরূপ। বর্তমানে বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে গড়ে উঠা রাজনৈতিক দল ক্ষমতাসীন। সুতরাং তৎকালীন সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত একটি দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় বিদ্যমান ঔপনিবেশিক ধারা দূরীভূত করে প্রশাসনকে কল্যাণকর, অধিকতর গতিশীল ও গণমুখী করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক গৃহীত প্রশাসনিক সংস্কারসমূহের আলোকে, বর্তমান সরকারের প্রশাসনকে পুণর্বিন্যস্ত করে সময়োপযোগি ও জনকল্যাণকর পদক্ষেপ গ্রহণে অনুপ্রাণিত হয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি।

সুদযুক্ত ঋণ নয়, দারিদ্র্য বিমোচনে জাকাতের ভূমিকা অনন্য

আল জামাল মোস্তফা সিদ্দাইনী (তমাল)
সহকারী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ

জাকাত ইসলামের পাঁচ রোকনের অন্যতম একটি। নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক প্রত্যেক নর-নারীর উপর জাকাত ফরজ করা হয়েছে। নামাজের পরেই জাকাতের স্থান। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয় জাকাত। অপরদিকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে জাকাত। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহতায়ালা নামাজ কায়েম করার নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে জাকাত প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে : "তোমরা নামাজ কায়েম করো, জাকাত প্রদান করো, আর নিজেদের জন্য কল্যাণকর যা কিছু আগে ভাগে পাঠাবে (করবে) তা আল্লাহর কাছে পাবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সব কাজ কর্ম দেখছেন" (সুরা-বাকারা : ১১০)। জাকাতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উদ্দেশ্য হল সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূর করা। দেশ, জাতি ও সমাজের জন্য দারিদ্র্য একটি বড় ও জটিল সমস্যা। দারিদ্র্যের কারণে সমাজে হতাশা ও বঞ্চনার অনুভূতি সৃষ্টি হয়। এর ফলে সমাজে দেখা দেয় নানা সংঘাত। আমাদের সমাজের অধিকাংশ সামাজিক অপরাধের পিছনে দারিদ্র্যের ভূমিকা প্রধান। দরিদ্র ও অভাবী মানুষের পুনর্বাসন সম্পূর্ণভাবে জাকাতের মাধ্যমে করা সম্ভব। দারিদ্র্য মোচনের একটি স্থায়ী পদ্ধতি হল জাকাত। ইমাম নববী (রহ) বলেছেন, "ফকির ও মিসকিনকে এতটুকু পরিমাণ সম্পদ দিতে হবে যাতে তাঁরা অভাবের গ্লানি থেকে মুক্তি পায় এবং ধনী ব্যক্তির পর্যায়ে এসে উপনীত হয়।" (ড. মাহমুদ আহমাদ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে জাকাতের ভূমিকা)। হজরত উমর ফারুক (রা.) বলেছেন, "যখন তোমরা ফকির মিসকিনকে কিছু দেবে, তখন তাকে ধনী বানিয়ে দেবে।" দারিদ্র্য বিমোচনে অর্থশালীদের প্রতি ইসলামের নির্দেশ হল, নিজের অর্থ বের করে দিলেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। অভাবী ও দরিদ্রাকে খুঁজে বের করতে হবে। তাদের সঠিক খোঁজ খবর নিতে হবে। জাকাতের অর্থ তাঁরা যাতে পায় তার জন্য অর্থশালীদের দায়িত্ব পালন করতে হবে সঠিকভাবে ইসলামের বিধান মোতাবেক।

জাকাত আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ পবিত্র ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া (দুররুল মুখতার)। আল্লামা শামী বলেছেন, উপরে দুটি অর্থ ছাড়াও জাকাত শব্দের আরো অর্থ আছে। যথা- বরকত ও গুণকীর্তন। বিভিন্ন ইসলামিক গ্রন্থে জাকাত শব্দ উল্লিখিত চতুর্বিদ অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে। জাকাতদাতাকে পাপ ও কৃপণতা থেকে মুক্ত করে। পবিত্র কোরআনে সুরা মুজাম্মিলের ২০ আয়াতে, সুরা আরাফের ১৫৬ আয়াতে, সুরা মরিয়মের ৩০ থেকে ৩২ ও ৫৫ আয়াতে, সুরা নমলের ১ থেকে ৩ আয়াতে, সুরা হামিম সিজদার ৬ থেকে ৭ আয়াতে, সুরা আম্বিয়ার ৭২ থেকে ৭৩ আয়াতে, সুরা মুমিনের ১ থেকে ১১ আয়াতে, সুরা রুমের ৩৯ আয়াতে, সুরা বাকারার ৪৩ থেকে ৪৬, ৮৩, ১১০, ১১৭ ও ২২৭ আয়াতে, সুরা আহযাবের ৩৩ আয়াতে, সুরা নিসার ৭৭ ও ১৬২ আয়াতে, সুরা নূরের ৩৭, ৫৬ থেকে ৫৭ আয়াতে, সুরা হজের ৩৪ থেকে ৩৫, ৪০ থেকে ৪১ ও ৭৮ আয়াতে, সুরা মুজাদালার ১৩ আয়াতে, সুরা মায়িদার ১২, ৫৫ আয়াতে এবং সুরা তওবার ৫, ১৮, ৭১ আয়াতে জাকাত দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। পবিত্র কোরআনের এ সব আয়াত থেকে সহজে বোঝা যায় জাকাত প্রদান থেকে বিরত থাকার কোনো অবকাশ নেই। জাকাত দয়া বা দান নয়। একজন ঈমানদার ব্যক্তিকে যে রকম নিয়মিত নামাজ আদায় করতে হয় ঠিক তেমনি জাকাতও আদায় করতে হয়। জাকাত দানে সম্পদশালীর সম্পদ বেড়ে যায় এবং তার অন্তর থেকে কলুষতা দূর করে পরিশুদ্ধতা এনে দেয়।

অন্যভাবে "সম্পদের উৎসসমূহ যথা-চন্দ্র, সূর্য, মাটি, বাতাস, মেঘ, বৃষ্টি প্রভৃতি আল্লাহতায়ালার দান। উৎপাদনের জন্য পুঁজি, শ্রম এবং এ সব স্রষ্টা প্রদত্ত সম্পদের প্রয়োজন। কাজেই উৎপাদিত বস্তুতে প্রকৃত প্রস্তাবে পুঁজি ও শ্রমের যেমন অধিকার আছে তেমনি তৃতীয় উপকরণ স্রষ্টার দানের জন্যও একাংশ স্থিরিকৃত থাকা উচিত। তাই হল জাকাত। সমাজের সঠিক কল্যাণের জন্য এ অংশ নির্দিষ্ট হওয়ার পর বাকি অংশ পরিশোধিত হয়, তখন তা অন্যান্য উপকরণের মধ্যে বন্টন করা যায়" (ড. এম.এ. মান্নান, ইসলামি অর্থনীতি : তত্ত্ব ও প্রয়োগ, ইসলামিক ইকোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ঢাকা)।

ইসলামে জাকাত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জাকাত আর্থিক লোভ থেকে মানুষকে দূরে রাখে। দারিদ্র্য দূরীকরণে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে থাকে। ইমাম ইবন তাইমিয়া বলেছেন, সাদকা প্রদানকারীর আত্মা পবিত্র হয়, তার ধনসম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং প্রকৃত পরিমাণে তা বেশি হয়'। আযহারী বলেছেন, "জাকাত দরিদ্রতা দূর করার সঙ্গে সঙ্গে ধনশালীর মন ও সম্পদেরও প্রবৃদ্ধি সাধন করে। বস্তুত

জাকাতের ক্রমবৃদ্ধি এবং পবিত্রতা কেবল ধন মালের মধ্যেই সাধিত হয় না: বরং জাকাতদাতার মনমানসিকতা ও ধ্যান-ধারণা পর্যন্ত তা পরিব্যাপ্ত হয়" । পক্ষান্তরে সুদের ভিত্তিতে প্রদত্ত ঋণসমূহ যন্ত্রণা, শোষণ ও ভারসম্যহীনতার ঘটনা ঘটে । দারিদ্র্যতা নির্মূল না হয়ে তাতে দারিদ্র্যের একটি অনতিক্রম্য চক্রের সৃষ্টি হয় । পবিত্র কোরআনে আল্লাহতায়ালা বলেছেন, "তুমি তাদের পবিত্র করে দাও আর তাদের জন্য রহমতের দোঁয়া পড় । কেননা দোঁয়া তাদের জন্য শান্তির বাহক । আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ" (সুরা তাওবা:১০৩) । আল্লাহতায়ালা আরো বলেছেন, "আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তোমরা যে জাকাত প্রদান কর, প্রকৃতপক্ষে সে জাকাতদাতারাই তাদের সম্পদ বৃদ্ধি করে" (সুরা তাওবা: ৬০) । জাকাত হচ্ছে সম্পদশালীর সম্পদে আল্লাহতায়ালা কর্তৃক নির্ধারিত দরিদ্র ও অভাবীদের অধিকার । পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে: "তাদের ধন সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতদেরও সুস্পষ্ট অধিকার রয়েছে ।" (সুরা যারিয়াত:১৯)

জাকাত প্রদানের বিষয়টি দাতার ইচ্ছার উপর মোটেই ছেড়ে দেওয়া হয়নি । প্রত্যেক ব্যক্তি যাতে স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে অভাবী জনগোষ্ঠীর কল্যাণার্থে তাদের যথাসর্বস্ব নিয়ে এগিয়ে আসে, সেজন্য ইসলাম শুরু থেকেই উৎসাহিত করেছে । জনগণের মনমানসিকতাকে সে লক্ষ্যেই গড়ে তুলেছে । অতঃপর ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম হওয়ার পর প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, প্রয়োজনীয় স্থায়ী আইন ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে জাকাত প্রদানকে বাধ্যতামূলক করে দরিদ্র অভাবীদের অধিকার সংরক্ষণের স্থায়ী ব্যবস্থা করেছে । "নিজ প্রয়োজনের অতিরিক্ত ন্যূনতম যে পরিমাণ সম্পদ অথবা অর্থের অধিকারী হলে জাকাত আদায় করা ফরজ এবং যা অপেক্ষা কম হলে জাকাত ফরজ হয় না, ওই পরিমাণ সম্পদকে ইসলামী পরিভাষায় নিসাব বলা হয়" । জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, স্থাবর সম্পত্তি ও আর্থিক ব্যয় বাদে ৭.৫ তোলা স্বর্ণ বা ৫২.৫ তোলা রৌপ্য বা সমপরিমাণ মূল্যের সম্পদ বা নগদ টাকা হচ্ছে জাকাতের নিসাব । নবী করিম (সা.) বলেছেন, "ধনীর ধন সম্পদ পুরো এক বছরকাল মালিকের অধিকারে না থাকলে তার জাকাত আদায় করার বাধ্যবাধকতা নেই" (বুখারী, মুসলিম, কিতাব আল জাকাত) । তিনি আরো বলেছেন, "মালিকানাধীন সম্পদের ওপর এক বছর অতিবাহিত না হলে জাকাত ওয়াজিব হয় না" (বুখারী, মুসলিম, কিতাব আল জাকাত) । জমির ফসলের জাকাত দেয়ারও নির্দেশ দেয়া হয়েছে । ফসলের জাকাতকে 'উশর' বলে । 'উশর' শব্দের অর্থ হলো দশ ভাগের এক ভাগ বা এক দশমাংশ । তাই ফসলের এক দশমাংশ দান করা ফরজ । মহান আল্লাহতায়ালা বলেছেন,'আর ফসল উৎপাদন হলে তা তোমরা খাও । আর ফসল কাটার দিন তার হক আদায় কর এবং সীমালঙ্ঘন করো না'(সুরা আনআম : ১৪১) । আল্লাহ আরো বলেছেন, "হে ইমানদারগণ, যে সম্পদ তোমরা উপার্জন করছ আর যা কিছু আমি তোমাদের জন্য জমি থেকে বের করেছি, তা থেকে উত্তম অংশ (আল্লাহর পথে) খরচ কর" (সুরা বাকারা:২৬৭) । হাদিসে 'উশর' সম্পর্কে বলা হয়েছে, হজরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যে সব জমিকে বৃষ্টির পানি ও নদীর পানি সিক্ত করে অথবা স্বভাবতই সিক্ত থাকে, তা থেকে উশর অর্থাৎ ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ দান করতে হবে । আর যে সব জমি সেচের মাধ্যমে সিক্ত হয় এক দশমাংশের অর্ধেক দান করতে হবে' (বুখারী, মুসলিম, কিতাব আল জাকাত) ।

স্বর্ণ রৌপ্যের তৈরি অলংকার ও জিনিসপত্রের তৈরি মূল্য হিসাব করে ২.৫ ভাগ জাকাত দিতে হবে । পবিত্র কোরআনের বিধান অনুসারে আট শ্রেণির লোক জাকাত পাবার দাবিদার । তারা হল গরিব, মিসকিন, জাকাত আদায়ে নিয়োজিত কর্মচারী, মন জয় করার জন্য, দাসত্ব মুক্তি, ঋনগ্রস্তদের ঋণ শোধ, আল্লাহর পথে মুজাহিদ ও মুসাফির বা প্রবাসী । তাই সঠিক পন্থায় কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে জাকাত সংগ্রহ ও তার বন্টনের ব্যবস্থা করতে পারলে দারিদ্র্য দূরীকরণে ব্যাপক ভূমিকা পালন করা সম্ভব । নবী করিম (সা.) বলেছেন, 'তোমাদের দরিদ্রদের মধ্যে তা বন্টন করার জন্য আল্লাহ আমাকে প্রেরণ করেছেন' (বুখারি মুসলিম শরীফ) । ইসলাম দারিদ্র্যকে পছন্দ করে না । সাহেবে নিসাব নয় এমন সব ব্যক্তিই দরিদ্র । পবিত্র আল-কোরআনে আল্লাহ বলেছেন 'দারিদ্র্য মানুষকে কুফরির পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে' । ইসলাম সমর্থন করে না এমন নিকৃষ্ট কাজের অন্যতম হল ভিক্ষাবৃত্তি । মহানবী (সা.) ভিক্ষাবৃত্তিকে ঘৃণা করতেন । তাই তিনি এটা নিষিদ্ধ করেছিলেন । তিনি শ্রমের মাধ্যমে স্বনির্ভর হতে বলেছেন । যারা যাকাতের হকদার তার মধ্যে ৬ শ্রেণির লোককে দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে হয় । এদের দারিদ্র্য মোচনে বর্তমান ব্যবস্থাপনার মধ্যেও যে সব কাজ করা যেতে পারে তা হলো:

১। জাকাত ফান্ড গঠন করে তা থেকে দরিদ্র ও অভাবী, দুঃস্থ, রুগ্ন, পঙ্গু, বৃদ্ধ, ইয়াতিম এবং অনুরূপ শ্রেণির অসহায় লোকেদের নিয়মিত ভাতার ব্যবস্থা করা ।
২। পুনর্বাসনের মাধ্যমে দরিদ্র ও অভাবীদের মানবিক মর্যাদাসম্পন্ন স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা ।
৩। দারিদ্র্যের কারণে যারা ঋণ পরিশোধ করতে পারে না তাদের ঋণ মুক্তির জন্য জাকাত দেওয়া ।
৪। দরিদ্র ও অভাবী লোকদের সন্তানদের জন্য জাকাতের অর্থে উন্নত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা ।
৫। জাকাতের অর্থে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর চিকিৎসার জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা সুবিধা দানে বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা ।
৬। বেকার, দরিদ্র লোকেদের জাকাত ফান্ড থেকে নিয়মিত ভাতা ও তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা ।
৭। দরিদ্র মেধাবী ছাত্রদের জন্য বিভিন্নভাবে সাহায্য করা । অপরদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প ইত্যাদিতে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের সাহায্য ও পুনর্বাসনে জাকাত তহবিল বিরাট অবদান রাখতে পারে ।

সীমাবদ্ধতার সীমানা পেরিয়ে

ড. মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন
সহযোগী অধ্যাপক, আইসিটি বিভাগ

দেখুন, শুনুন এবং ভাবুন। আকাশের দিকে দেখুন, ভূমির দিকে নজর করুন, আপনার ডানে ও বামে লক্ষ্য করুন। বিশ্ব ভূখণ্ডের সব কিছু কি অনুভব করার আপনার আমার সাধ্য আছে? বিজ্ঞান বলে চোখের সাধারণ দৃষ্টি সীমা ২০ ফুট। ২০ ফুট পরের বস্তু অস্পষ্ট দেখবেন অর্থাৎ দূরত্ব বাড়ার সাথে সাথে বস্তুগুলো অদৃশ্য হয়ে যাবে। আপনি কি বলবেন যা দেখি না তা মানি না বা বিশ্বাস করি না। বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দূরের বস্তু দেখানোর চেষ্টা হিসাবে দূরবিক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন। আপনি এই যন্ত্রের সাহায্যে মহাবিশ্বের গ্রহ, উপগ্রহ অথবা সৌরজগতের কিছু অংশ দেখবেন। কিন্তু কত অংশ? অতি ক্ষুদ্র প্রাণী ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস জীবণুগুলোর আকার বা ওজন কত? চোখের স্বাভাবিক দৃষ্টিতে তা দেখা সম্ভব নয়। কিন্তু বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত চিন্তা ভাবনায় অনুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার হলো। অনুবীক্ষণ যন্ত্র আমাদের দেখালো না দেখা বস্তুসমূহের কত অজানা তথ্য! কিন্তু আমরা কতটুকু জানতে পেরেছি! অতি সামান্য। সূর্যের আলোর অসংখ্য রশ্মির কয়টি আলোক রশ্মি আমাদের দৃশ্যপট হয়! আমরা জানতে পেরিছি সকাল বেলায় সূর্যের আলোতে ভিটামিন 'ডি' বিদ্যমান। তাই আমাদের মা-বাবারা শিশুদের শরীরে ভিটামিন 'ডি' এর প্রয়োজন পূরণ করিয়েছেন সকাল বেলার সূর্যালোকে। আমরা যখন ভিটামিন 'ডি' নিয়ে ব্যস্ত বিশ্বের অন্য প্রান্তে গবেষণা চলে সূর্যালোকের α-রশ্মি, β-রশ্মি ও γ-রশ্মি নিয়ে। আমরা যখন বেনীআসহ কলা (সূর্যালোকের রংসমূহ) বিষয়ে জানতে শুরু করি, বিশ্বের অন্য প্রান্তে সূর্যালোক রশ্মি ব্যবহার করে পরমাণু ক্ষমতাধর দেশ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। ভাবুন চর্ম চোখের কি এত ক্ষমতা আছে যে খালি চোখে সূর্যের সকল আলোক রশ্মি দেখবেন! না তাহলে কীভাবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ অদৃশ্য রশ্মি ব্যবহার করে উন্নতির চরম শিখরে পৌছে গেল? বিজ্ঞানীদের কি ভিন্ন কোন চোখ আছে যেটার ক্ষমতা এত বেশি যে অদৃশ্য জিনিসগুলো দেখতে বা অনুভব করতে সাহায্য করে? চিন্তা করুন আমাদের একই ক্ষমতা নেই কেন অথবা কম কেন? কিসের অভাবে সেই ক্ষমতা সৃষ্টি হচ্ছে না অথবা কেন আমরা নিজেকে সেইভাবে তৈরি করতে পারছি না?

এক বার এক বিজ্ঞানী মানুষের রুহ বা আত্মার ওজন বের করার সিদ্ধান্ত নিল। বিশেষ গবেষণাগার তৈরি করা হল। মুমূর্ষু এক ব্যাক্তিকে গবেষণাগারে আনা হলো। ব্যাক্তির ব্লাড প্রেশার (বিপি) নেওয়া হলো এবং ওজন মাপা হলো। গবেষণাগারে বিশেষ কক্ষের প্রবেশের পূর্বে তার ওজন ছিল ৭০ কেজি। কিছুক্ষণ পর লোকটি মারা গেল। তার বিপি নেই এবং ওজন পাওয়া গেল ৬৮ কেজি। বিজ্ঞানীরা আনন্দিত রুহের বা আত্মার ওজন ২ কেজি (৭০-৬৮ = ২ কেজি)। এইভাবে একটি নমুনা থেকে রুহের ওজনের সত্যতা প্রমাণিত হয় না। তাই আরেকটি চরম অসুস্থ ব্যক্তি আনা হলো। বিপি মাপা হলো এবং ওজন পাওয়া গেল ৭৯ কেজি। কিছু সময়ের পর এই ব্যাক্তিটিও মারা গেল। বিপি নেই এবং ওজন নেওয়া হল ৮০ কেজি। বিজ্ঞানীরা হতাশ ওজন ১ কেজি বেড়ে গেল। রুহের ওজন মাপা সম্ভব হলো না। গবেষণা চলছে চলবে, সীমাবদ্ধতার সীমা অতিক্রম করার। তারের মধ্য দিয়ে শব্দ সঞ্চালন এক সময়ের অসম্ভব ভাবনা সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভব হয়ে গেল। এখনতো Wireless পদ্ধতিতে সংকেত প্রেরণ ও শব্দ সঞ্চালন হয়। বাংলাদেশ থেকে কানাডায় ফোন করলাম। অল্প কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে অপর প্রান্ত থেকে কল রিসিভ করলো, কথোপকথন হলো। কোনো পার্সপোর্ট এবং ভিসা ছাড়া কথোপকথন হলো। বলুনতো, বাংলাদেশ থেকে কানাডার দূরত্ব কত? হাজার হাজার দূরত্ব অতিক্রম করতে কয়েক সেকেন্ড সময় নিল একটি তরঙ্গ। সীমাবদ্ধতার দেয়াল ভেঙ্গে দিল গবেষকরা। আমাদের জ্ঞানের পরিধি অথবা ব্যাপ্তি কতটুকু? চিন্তার সীমানা, ভাবনা পরিধি, জ্ঞানের শক্তি বাড়ানোর দরকার আছে কি? পৃথিবী থেকে মঙ্গল গ্রহের দূরত্ব প্রায় ৫৪.৬ মিলিয়ন কিলোমিটার। চর্ম চোখে দেখা যায় না, সম্ভবও নয়। কিন্তু দেখুন পৃথিবী, মঙ্গল এবং সমগ্র সৌরজগত চলমান অর্থাৎ ঘুরছে। পৃথিবীর কোনো স্থান থেকে রকেটের মাধ্যমে রোবট পাঠাচ্ছে বিজ্ঞানীরা। হাজার হাজার দূরত্বে অবস্থিত চলমান পৃথিবী থেকে চলমান মঙ্গল গ্রহের কোনো স্থানে রোবটটি স্থাপিত হবে বিজ্ঞানীরা বলে দিচ্ছে এবং নিয়ন্ত্রণ করছে। ভেবে দেখুন গবেষকদের জ্ঞানের পরিধি কত ব্যাপক,

চিন্তার সীমানা কত উচ্চতায় পৌঁছে যাচ্ছে। আমরাও পিছিয়ে নেই, তবে যতটুকু অর্জন করা সম্ভব ছিল তার তুলনায় কম। মেধাবী মানুষের অভাব আমাদের দেশে নেই। বুয়েট শিক্ষক ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ স্যারের গল্প মনে পড়ে গেল। বিদেশি অধ্যাপক যখন জানলেন স্যার বাংলাদেশি তখন হেয় প্রতিপন্ন করে বলেছিল বাংলাদেশ গরীব দেশ। তখন স্যার বলেছিল আমাদের দেশ গরীব নয়। অধ্যাপককে জিজ্ঞেস করেছিল আপনার দেশে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে কতজন লোক বসবাস করে? উত্তরে বলেছিল ৭ বা ৮ জন। আর আমার দেশে প্রায় ১২৭৮ জন বসবাস করে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে। আপনার ৮ জনের মধ্যে কত জন মেধাবী মানুষ আছে। আমার দেশেতো হাজার হাজার মেধাবী মানব সম্পদ আছে। যে দেশে এত মানব সম্পদ সেই দেশ কি করে গরিব হয়! প্রফেসরও মেনে নিয়ে ছিলেন। সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত মানুষের মস্তিষ্কের ধারণ ক্ষমতা কতটুকু আশা করি বুঝতে পেরেছেন। এই মস্তিষ্কের বিকাশের মাধ্যমে দৃশ্য অদৃশ্য জিনিস দেখা যায়। বিশ্ব জয় করে, সীমানার দেয়াল ভেঙ্গে সমগ্র বিশ্ব আপনার হাতের মুঠোয় আনতে মস্তিকের সর্বোচ্চ ১০%(প্রায়) ব্যবহার হয়েছে গবেষকদের। বাকী ৯০% ব্রেইন ব্যবহার হলে এই মহাবিশ্বের অনেক অজানা তথ্য জানা যাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাহলে আমাদের Brain এর অবস্থা কী ভাবুন। প্রায় ১ মিলিয়ন নিউরন নিয়ে মানব Brain গঠিত। ইহার ধারণ ক্ষমতা প্রায় ২.৫ পেটাবাইটস বা এক মিলিয়ন মেগাবাইটস। বিশাল ধারণ ক্ষমতা সম্পূর্ণ ব্রেইন আমদের কাজে লাগাতে হবে। মানব ব্রেইন কাজে লাগিয়ে মনের সীমাবদ্ধতা, সমাজের সীমাবদ্ধতা, দেশের ও বিদেশের সীমাবদ্ধতা দূর করে মানব কল্যাণে এগিয়ে আসতে হবে। সীমাবদ্ধতার সীমা লঙ্ঘন না করে সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত মস্তিষ্ককে আমরা যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারলে মানুষ হিসাবে আমাদের জীবন সার্থক হবে।

ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক

শায়লা সোলায়মান
সহকারী অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ

প্রাথমিক, মাধ্যমিক অথবা উচ্চশিক্ষা যেকোনো পর্যায়েই উন্নত শিক্ষাব্যবস্থার জন্য ছাত্র-শিক্ষক সুসম্পর্ক থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ইতিবাচক সম্পর্ক বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। কেননা এ পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীরা মানসিকভাবে থাকে পরিপক্ক, তারা জগতের ভালো-মন্দ বোঝে, যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে শিক্ষককে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে। এমনকি শিক্ষকের সহযোগিতা না পেলে তারা লেখা-পড়ায় অনীহা প্রকাশ করতে পারে। শিক্ষকরা একটি জাতির পথ প্রদর্শক, ছাত্ররা একটি দেশের ভবিষ্যৎ নেতা এবং উদ্যোক্তা।

বাবা-মায়ের পরেই দ্বিতীয় অভিভাবক হিসেবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের সাফল্যে শিক্ষক সবচেয়ে বড় শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে থাকেন। একজন শিক্ষক একইসাথে একজন বন্ধু, পরামর্শদাতা এবং পথপ্রদর্শক। শিক্ষক ভালো বা মন্দ যাই হোক না কেন, শিক্ষকরাই সমাজের আদর্শ ব্যক্তিত্বের প্রতিমূর্তি। অতীতকাল থেকেই দক্ষিণ এশিয়ায় শিক্ষকদের আদর্শের প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। প্রাচীনকাল থেকেই তাঁদের "গুরু" অথবা "পরামর্শদাতার" সম্মান দেওয়া হয়। শিক্ষকদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ে আসন করে দেওয়া এই অঞ্চলের ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কেও পরিবর্তন এসেছে। এখন ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক অনেক বেশি আনুষ্ঠানিক ও পেশাদারি। তা সত্ত্বেও সুসম্পর্ক পারস্পরিক শ্রদ্ধার ওপর নির্ভরশীল ।

ছাত্র-শিক্ষক সুসম্পর্কে একজন শিক্ষকের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। শিক্ষার জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষিকার দায়িত্ব। শ্রেণিকক্ষে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যেকোনো প্রশ্ন করতে উদ্বুদ্ধ করা হলে শিক্ষার্থীরা স্বাচ্ছন্দ্যে এবং নির্ভয়ে তাদের কৌতূহল মেটাতে পারে। এভাবেই লেখা-পড়া আরো আকর্ষণীয় এবং আনন্দদায়ক হয়ে উঠতে পারে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো শিক্ষার্থীদের প্রতি শিক্ষকের নেতিবাচক ধারণা পোষণ না করা এবং উদার মনোভাব নিয়ে তাদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা। কারণ, বিশ্ববিদ্যালয় হলো মুক্ত চিন্তা এবং সেই চিন্তার অভিব্যক্তি প্রকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ জায়গা। শ্রেণিকক্ষে কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থী জড়তায় নিজেদের গুটিয়ে রাখে। সাহায্যের প্রয়োজন হলেও তারা শিক্ষকদের দ্বারস্থ হতে চায় না। এই পরিস্থিতিতে একজন শিক্ষককে যত্নশীল এবং বন্ধুসুলভ আচরণ করতে হবে। যদিও একজন শিক্ষকের পক্ষে শ্রেণীকক্ষের প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সকল সমস্যা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়, তবে সঙ্কোচবিহীন যোগাযোগ, শ্রেণিকক্ষে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ এবং শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের সুবিধা-অসুবিধা জানার প্রতি আগ্রহ প্রদর্শন শ্রেণিকক্ষে ছাত্র-শিক্ষকের মাঝে সুসম্পর্ক সৃষ্টি করবে। যেহেতু দুই পক্ষের মাঝে সুসম্পর্ক শুধুমাত্র শিক্ষকদের উপরেই নির্ভর করে না, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের ভূমিকাও এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। সুসম্পর্ক নির্ভর করে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের ওপর যা উভয় পক্ষই বাধাগ্রস্ত করতে পারে।

আমার শিক্ষাজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলাম তখন আমাদের শ্রেণিকক্ষে তিন শ্রেণির শিক্ষার্থীর উপস্থিতি লক্ষ্য করেছি। প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে যথেষ্ট মনোযোগী, স্পষ্টভাষী এবং সবসময়েই শিক্ষকদের সাথে যোগাযোগ রাখে। দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে নির্বাক শ্রোতার মতো অর্ন্তমুখী, শান্ত এবং লাজুক। তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীরা সবসময়েই শ্রেণিকক্ষের শেষ সারিতে বসে এবং অধিকাংশ সময়েই তারা ক্লাস চলাকালে হট্টগোল করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। অন্যান্য শ্রেণির তুলনায় প্রথম শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীরা সব সময়েই পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জন করে। আমি শিক্ষক হওয়ার পরবর্তী সময়ে আমার ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝেও এই তিন শ্রেণির উপস্থিতি আবিষ্কার করেছি। ক্লাস চলাকালে কিছু শিক্ষার্থী তাদের মোবাইল ফোন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যায়, সবসময়ই ক্লাসে দেরিতে প্রবেশ করে, কেউ নিজেকে গুটিয়ে রাখে আর খুব কম সংখ্যকই মনোযোগী। একজন ভালো শিক্ষকের দায়িত্ব হচ্ছে এমন একটি পরিবেশ

তৈরি করা, যার মাধ্যমে প্রত্যেক ধরনের শিক্ষার্থী সমানভাবে শিক্ষকের সান্নিধ্য পেতে পারে। শিক্ষকের উচিৎ সবধরনের ছাত্র-ছাত্রীকে তাদের পড়াশোনা নিয়ে যেকোনো সমস্যায় পরামর্শের জন্য তাঁর সাথে দেখা করতে উৎসাহিত করা।

এখানে উল্লেখ্য, সুসম্পর্কের অর্থ এই নয় যে ছাত্রছাত্রীদেরকে সব সময়েই শিক্ষকদের সাথে কথা বলার অনুমতি দেওয়া এবং ছাত্রছাত্রীরা নিজেদেরকে শিক্ষকের বন্ধু মনে করে ব্যক্তিগত সবকিছু ভাগাভাগি করবে। পেশাগতভাবে সুসম্পর্কের জন্য একটি সীমারেখা থাকা দরকার, যার প্রতি উভয় পক্ষই শ্রদ্ধাশীল হবে। অর্থাৎ ভালো সম্পর্ক হলো যে সম্পর্কে ভারসাম্য বজায় থাকে। বাংলাদেশে অল্পসংখ্যক সৌভাগ্যবান শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেয়ে থাকে। তবে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সঠিক জ্ঞান এবং প্রশিক্ষণের অভাবে বাংলাদেশ উচ্চশিক্ষায় সর্বোচ্চ ফলাফল অর্জনে ব্যর্থ হয়।

পরিশেষে, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের উপর একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষাদান ও পড়ার মান নির্ভর করে। একজন শিক্ষার্থীর একাডেমিক সাফল্য অথবা ব্যর্থতা ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের দ্বারা অনেকাংশে নির্ধারিত হয়। অতএব, সুষ্ঠু শিক্ষার পরিবেশের জন্য একটি সহায়ক ও ইতিবাচক ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক বজায় রাখা দরকার।

বই, বইমেলা বই দিবস ও অন্যান্য

এমদাদ উল্লাহ বিন শহীদ
সহকারী রেজিস্ট্রার

বিখ্যাত আমেরিকান লেখক ভিনসেন্ট স্টারেট বলেছেন, 'আমরা যখন বই সংগ্রহ করি, তখন আমরা আনন্দকেই সংগ্রহ করি'। জ্ঞানের আলোয় নিজেকে আলোকিত করতে ও অবসর সময়কে কাজে লাগাতে তথা মনের খোরাক যোগাতে বই পড়ার বিকল্প নেই। জীবনে একবারও কোনো বই পড়েননি এমন লোক হাজারেও একটা খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু আমরা ক'জনই বা জানি এই বই কীভাবে এলো, কখন প্রথম কাগজ আবিষ্কৃত হয় কিংবা মুদ্রণযন্ত্রের গোড়াপত্তনই বা করেন কারা? বই দিবস কিংবা বইমেলার উৎপত্তি কীভাবে? চলুন সংক্ষেপে জেনে নেওয়া যাক।

বই কী?

উইকিপিডিয়া অনুসারে, বই (Book) বলতে লেখা, ছাপানো অক্ষর বা ছবি বিশিষ্ট কাগজ বা অন্য কোনো মাধ্যমের তৈরি পাতলা শিটের সমষ্টিকে বোঝায়, যা এক পাশে বাঁধা থাকে এবং রক্ষামূলক মলাটের ভেতরে আবদ্ধ থাকে। এর প্রতিটি পাতলা শিটকে বলে পৃষ্ঠা বা পাতা।

বই কীভাবে এলো?

বই কিভাবে এলো এ নিয়ে নানা জনের নানা মত। সম্রাট অশোকের জন্মেরও চার হাজার বছর আগে আসিরিয়া ও ব্যাবিলন নামে দুটি দেশ ছিল। জানা যায়, এই দুটি দেশেই প্রথমে পাথরের উপর লেখার প্রচলন শুরু হয়েছিল। মাটি খোদাই করে ব্যাবিলনের একটি লাইব্রেরিতে এ রকম ২২ হাজারেরও বেশি পাথুরে গ্রন্থ পাওয়া গেছে।

কিন্তু মানুষ নতুন কিছু খুঁজছিল। অবশেষে মিশরের লোকেরা খুঁজে পেল নতুন কিছু। মিশরের নীলনদের তীরে জলাভূমিতে লম্বা প্যাপিরাস নামক এক ধরনের গাছ ছিল। মিশরের অধিবাসীরা এই গাছের পাতায় লেখালেখি শুরু করল। পরবর্তীতে প্যাপিরাস বিশ্বের অন্যত্রও ছড়িয়ে পড়ে। 'ইংরেজি' পেপার শব্দটির উৎপত্তি এই প্যাপিরাস থেকেই ।

মিশরিয়রা প্যাপিরাস ব্যবহার করলেও চীনারা লিখত বাঁশের ফলক ও কাপড়ে। আবার ছাত্ররা তাদের হোমওয়ার্ক করতো মোমের শিটে। এসব সমস্যা সমাধানে সবাই বিকল্প খুঁজছিল দীর্ঘদিন ধরে। আর এ ভাবনাটা বেশি ভাবাতো তখনকার চীন সম্রাটের 'সাইলুন' নামের এক উপদেষ্টাকে। সাইলুন একদিন কাপড়ের টুকরো, গাছের ছালের মত অনেক কিছু একসঙ্গে মিশিয়ে গুড়ো করে নানা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে একসময় কাগজ তৈরি করলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এটাই ছিল মানুষের তৈরি প্রথম কাগজ। তারপর আরবদের মাধ্যমে ইউরোপসহ সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে কাগজ তৈরির কৌশল। বই ছাপাবার পদ্ধতিও চীনারাই প্রথম আবিষ্কার করেছিল। ইউরোপে মুদ্রণ যন্ত্র আবিষ্কারের আগ পর্যন্ত সব বইই হাতে লেখা হত। দীর্ঘদিন পর ১৫ শতকে জার্মানির জোহানেস গুটেনবার্গ উদ্ভাবন করলেন আধুনিক মুদ্রণ যন্ত্র।

কারও কারও মতে, পৃথিবীর প্রথম ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত বই হচ্ছে খ্রিষ্টানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বাইবেল। ৩৮০ খ্রিষ্টাব্দে প্রণীত ল্যাটিন সংস্করণটি প্রথম ছাপা হয় ছাপাখানায়। জার্মানির মেইঞ্জ শহরের জোহানেস গুটেনবার্গ ১৪৫২-১৪৫৫ সালের মধ্যে গ্রন্থটি ছাপেন। যদিও জার্মান বিবলিও গ্রাফার'দের দাবি, গুটেনবার্গের এই মুদ্রণের পূর্ণতা পায় জোহান ফস্ট ও পিটার স্কফার এর মাধ্যমে। জোহান ফস্ট ছিলেন একজন ধনী ব্যবসায়ী, যিনি গুটেনবার্গের ব্যবসার আইনি অংশীদারিত্ব লাভ করেন এবং পিটার ছিলেন গুটেনবার্গের সহযোগী। ১৭৬০ সালে কার্ডিনাল জুলস মাজারিন ফরাসি এক স্টেটসম্যানের গ্রন্থের ভিতরে প্রথম ছাপা হওয়া বাইবেলের একটি কপি খুঁজে পান। পৃথিবীর সব থেকে পুরাতন ছাপার অক্ষরে ল্যাটিন ভাষায় মুদ্রিত এই বাইবেলকে প্রকাশকের নামানুসারে 'গুটেনবার্গ বাইবেল' বলা হয়ে থাকে।

বাংলা ভাষায় মুদ্রিত প্রথম বই

প্রশ্ন জাগতে পারে, আমাদের প্রাণের ভাষা বাংলায় প্রথম বই কোনটি? চর্যাপদের রচনার ব্যাপারে বাংলা ভাষার পণ্ডিতরা একমত হতে পারেননি। কারও মতে চর্যাপদ ৬৫০-৯০০ খ্রিস্টাব্দে লিখিত, কারও মতে ১০০০-১২০০ সালে। ১৯০৭ সালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজদরবারের লাইব্রেরি থেকে চর্যাপদের একটি খণ্ডিত পুঁথি খুঁজে পান। এবার আসা যাক, বাংলা ভাষার প্রথম মুদ্রিত বই সম্পর্কে। যতদূর জানা যায়, পৃথিবীর প্রথম বাংলা হরফে মুদ্রিত বই প্রকাশিত হয়েছিল প্যারিসে ১৬৮২ সালে। বইটির কিছু ছিন্ন পাতা পাওয়া গিয়েছিল। এরপর ১৭২৫ সালে জার্মানিতে আরেকটি বাংলা বই ছাপা হয়েছিল। সেটিরও ছেঁড়া পাতার নমুনা পাওয়া গেছে। বাংলায় লেখা সবচেয়ে পুরনো যে মুদ্রিত বইটি পাওয়া গেছে তা মনোএল দ্য আসসুম্পসাঁও রচিত 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'। বইটি মুদ্রিত হয়েছিল রোমান হরফে। বইটি লেখা হয়েছিল ১৭৩৩ খ্রিস্টাব্দে। স্পেনের লিসবন থেকে ছেপে বের হয় ১৭৪৩ সালে।

গ্রন্থাগারের ইতিহাস

উদ্ভবের দিক থেকে গ্রন্থাগারের ইতিহাসও গ্রন্থের মতো সুপ্রাচীন। অনুমান করা হয়, সুপ্রাচীন অ্যাসিরিয় সভ্যতায় গ্রন্থাগারের গোড়াপত্তন হয়েছিল। খ্রিষ্টপূর্ব ৭ম শতাব্দীতে মধ্যপ্রাচ্য-এশিয়া মাইনর কেন্দ্রিক অ্যাসিরিয়ান সভ্যতার রাজা আসুরবানিপাল (Assurbanipal) তার নিজস্ব সংগ্রহশালার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তিনি একাধারে সেনাপতি, যোদ্ধা, প্রশাসক এবং গ্রন্থপ্রেমী ও বাস্তব গ্রন্থাগারিক ছিলেন। অনেকগুলো গবেষণায় যা বলা হয়েছে, তাতে এই রাজার গ্রন্থাগারিক পরিচয়টি স্পষ্ট। বিশ্বের প্রাচীনতম ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারগুলোর মধ্যে আসুরবানিপাল-এর গ্রন্থাগারটি অন্যতম। তিনি তার সাম্রাজ্যের রাজধানী নিনেভহ (Nineveh) -এ একটি জাতীয় গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা গড়ে তোলেন। খ্রিষ্টপূর্ব ৬৬৮-৬২৬ অব্দে তার পিতামহ সেনাচেরিব কর্তৃক যে সংগ্রহের সূচনা হয়েছিল তার সঙ্গে আরও অনেক সংগ্রহ যোগ করে আসুরবানিপাল তার রাজধানী নিনেভহ-তে হাজার হাজার মাটির চাকতি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারটি গড়ে তুলেছিলেন। সেগুলোই ছিল সভ্যতার উষালগ্নের সেই আদি পাঠাগারের প্রথম সংগ্রহ, যা ছিল আজকের আধুনিক গ্রন্থের আদিরূপ। আসুরবানিপাল গ্রন্থাগারের মৃন্ময় চাকতি, ছাপ ও বক বইয়ের মতোই ভূমধ্যসাগরের ক্রিট দ্বীপে বিপুল সংখ্যক মৃৎপাত্রের গায়ে উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া গেছে। অ্যারিস্টটলের স্কুল 'লাইসিয়াম'-এর মতোই প্লেটোর স্কুল 'একাডেমি'-তেও সুবিশাল গ্রন্থাগার ছিল।

বিশ্ব বই দিবস

১৯৯৫ সাল থেকে ইউনেস্কোর উদ্যোগে প্রতিবছর ২৩ এপ্রিল বিশ্ব বই দিবস হিসেবে পালিত হয়ে থাকে। বই দিবসের মূল লক্ষ্য হলো- বই পড়া, বই ছাপানো, বইয়ের কপিরাইট সংরক্ষণ করা ইত্যাদি বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি। বই দিবসের মূল ধারণাটি আসে স্পেনের লেখক ভিসেন্ত ক্লাভেল আন্দ্রেসের নিকট থেকে। ১৬১৬ সালের ২৩ এপ্রিল মারা যান স্পেনের আরেক লেখক মিগেল দে থের্ভান্তেস। আন্দ্রেস ছিলেন তার ভাবশিষ্য। নিজের প্রিয় লেখককে স্মরণীয় করে রাখতেই ১৯২৩ সালের ২৩ এপ্রিল থেকে আন্দ্রেস স্পেনে পালন করা শুরু করেন বই দিবস। অবশেষে ১৯৯৫ সালে ইউনেস্কো দিনটিকে বিশ্ব বই দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এরপর থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রতিবছর ২৩ এপ্রিল বিশ্ব বই দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।

বই মেলার ইতিহাস

বইমেলার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এর ইতিহাসও বই মুদ্রণের ইতিহাসেরই প্রায় সমকালীন। ইউরোপের ফ্রাঙ্ক, গ্রিস, লিঁও, প্যারিস ও ফ্রাঙ্কফুর্টে বইমেলা খুবই প্রাচীন। ইউরোপে বইকে দেখা হয়েছে একই সঙ্গে অর্থনৈতিক পণ্য ও সাংস্কৃতিক উপাদান হিসেবে। সে কারণেই এর প্রচার, প্রসার ও বাজার সৃষ্টির জন্য ওই সব দেশে বইয়ের পসরা সাজিয়ে বই-বিক্রেতারা বসেছে নানা জায়গায়। বই কেনাবেচার এই আয়োজনকেই একালে চিহ্নিত করা হয়েছে বইমেলা হিসেবে।

তবে বইয়ের কেন্দ্র হিসেবে প্রাচীন মিসর, চীন আর ভারতের কথাও ভুলে গেলে চলবে না। ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশে একদিকে উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে কলকাতায় ব্রিটিশ মিশনারিদের প্রচেষ্টায় যেমন আধুনিক মুদ্রিত বইয়ের সূচনা, তেমনি বটতলার বইয়ের বিশাল বিস্তারের কথাও অনেকের জানা।

বাংলাদেশে বই মেলার ইতিহাস স্বাধীন বাংলাদেশের মতোই প্রাচীন। যতদূর জানা যায়, ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে চিত্তরঞ্জন সাহা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন বর্ধমান হাউজ প্রাঙ্গণে বটতলায় এক টুকরো চটের ওপর কলকাতা থেকে আনা ৩২টি বই সাজিয়ে বইমেলার সূচনা করেন। এই ৩২টি বই ছিলো স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত বাংলাদেশি শরণার্থী লেখকদের লেখা বই। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি একাই বইমেলা চালিয়ে যান। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলা একাডেমির তৎকালীন মহাপরিচালক আশরাফ সিদ্দিকী বাংলা একাডেমিকে মেলার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত করেন। ১৯৮৩ সালে

বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কাজী মনজুরে মওলা বাংলা একাডেমিতে প্রথম "অমর একুশে গ্রন্থমেলা"র আয়োজন করেন। ১৯৮৪ সালে সাড়ম্বরে বর্তমানের অমর একুশে গ্রন্থমেলার সূচনা হয়। সেই ৩২টি বইয়ের ক্ষুদ্র মেলা কালানুক্রমে বাঙালির সবচে স্বনামধন্য বইমেলায় পরিণত হয়েছে।

বই আমাদের মাঝে জ্ঞানের আলো ছড়ায়, বই আমাদের শ্রেষ্ঠ বন্ধু। সুতরাং বই হোক নিত্য সঙ্গী।।

তথ্যসূত্র :

১. উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ (https://bn.wikipedia.org/s/op3)

২. বইমেলার ইতিহাস ও নতুন আঙ্গিকে বইমেলা, শামসুজ্জামান খান।

৩. Mahfuz Sadique (মার্চ ০২, ২০০৭) (ওয়েব), The Daily New Age, ঢাকা।

৪. banglapedia.org

৫. www.natunsomoy.com এ প্রকাশিত নিবন্ধ (২৯ জানুয়ারি ২০১৬)

৬. কালের কণ্ঠ (অনলাইন), ২৩ এপ্রিল, ২০১৭

৭. বাংলানিউজ২৪ডটকম এ অধ্যাপক ড. মাহফুজ পারভেজ এর প্রকাশিত ফিচার (১৩ মে ২০১৭)

৮. "Invention of Paper". www.ipst.gatech.edu. Retrieved 2018-04-11.

৯. somewhereinblog.net, techtunes.com.bd সহ অন্যান্য ব্লগে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত নিবন্ধ

১০. ইন্টারনেটে প্রকাশিত অন্যান্য সূত্র।

প্রকৃতির মানুষ আইন ও নৈতিকতা

তাসমিয়া সাবেরা
প্রভাষক, আইন বিভাগ

প্রকৃতিকে ভালবাসে না মানুষ, আংশিক পছন্দ করে। বিশেষ করে প্রকৃতিকে যখন মানুষের জন্য আরামদায়ক এবং ডোমেস্টিকেট করা হয় তখন তার প্রকৃতি ভাল লাগে। যখন জনমানবহীন এক অরণ্যের পাশে সবুজ মাঠের উপর নীল আকাশ আর পাশে টলটলে পানির এক নির্জন নদী বয়ে যায় তখন সে ভালবেসে ওঠে। কিন্তু এর সাথে টাইফয়েড, ম্যালেরিয়া, বাঘ, হায়না, সাপ, গুবরে পোকারা থাকলে তখন ম্লান মুখে ফিরতে ফিরতে মনে মনে সভ্যতাকে ধন্যবাদ দেয়। এর বাইরে প্রকৃতির সাথে মানুষের সম্পর্ক থমথমে। পুরো মানবসভ্যতা টিকে থাকল কি না থাকল এমনকি বিশ্বজগৎ টিকল কিনা তা নিয়ে প্রকৃতির কোনো মাথাব্যথা নেই। মানুষরা প্রকৃতির এত স্ট্রেঞ্জনেস সহ্য করতে পারে না। তাই প্রকৃতির যে অংশ তার নিজের জন্য ক্ষতিকর তার নাম দিয়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ। মানুষও প্রকৃতির অংশ। সে জীবজগতের মধ্যে প্রাণিজগৎ নামক এক জগতের লোক। কিন্তু নিছক প্রাণি সে নয়। প্রাণীত্বের পাশাপাশি অতিরিক্ত রকমের চিন্তা, কল্পনা আর দুশ্চিন্তা করার নেশা তার থাকায় সে নিজের জন্য একের পর এক তত্ত্ব বানিয়েছে।

কী করা ঠিক হবে?
কী করা ঠিক হবে না?
কীভাবে করলে ঠিক হবে?

এই তত্ত্বগুলো মূলত একেকটা স্বপ্নের পৃথিবী। একেকজনের স্বপ্নের পৃথিবী একেকরকম। তাই তাদের মধ্যে ঝগড়া, মারামারি, ষড়যন্ত্র ও যুদ্ধ চলতে থাকে। তাদের মধ্যে কে কখন জিতবে তা গুরুত্বপূর্ণ নয় প্রকৃতির কাছে।
কিন্তু মানুষকে বিভিন্ন ধরনের তত্ত্বের জামাকাপড় পরানো হলেই তার ভেতরের নিছক প্রাণি (Naked Man বা Animal Instinct) সেটা মানতে পারে না। এই নিছক প্রাণি তো কতকিছু দিয়ে তাড়িত হয়। স্মৃতিকাতরতা, হিংসা, হরমোন, রক্তশূন্যতা, একাকিত্ব, সামাজিকতা। তাই কোনো সিস্টেমই পারফেক্টলি জাস্ট সোসাইটি আনতে পারে না।

মানুষের স্বপ্ন বস্তু যন্ত্রণায় তৈরি এই তত্ত্বগুলি আসলে প্রাকৃতিক নয়। এদের নাম দেওয়া যায় মানবিক, Man Made বা মানব নির্মিত। এই মানবিক নিয়মগুলো নিছক প্রাণির প্রবণতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। নিছক প্রাণি অনেক সময় ভয়ে ভয়ে বশ মানে। আবার কোনো কোনো দুপুরে প্রচণ্ড শব্দ করে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে ফেটে পড়ে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মানুষদের সামনে। আইন কতটা বাঁধবে আর কতটা ছাড়বে এই নিছক প্রাণিকে? তা নিয়ে অনেকটা একমত হয়েছে সমসাময়িক পৃথিবীর জুরিস্টরা। তা নিয়ে ভাঙ্গাগড়ার মধ্য দিয়ে সমাজ চলতে থাকবে। আইন এখন পর্যন্ত এতটুকু বলতে পারে-অন্যের ক্ষতি না করে যা খুশি করতে পারো। আমি বাঁধা দেব না।

কিন্তু নৈতিকতা কতটা বাঁধবে আর কতটা ছাড় দেবে মানুষকে? যাদের নৈতিকতার প্রায়োরিটি লিস্টে শুরুতেই আছে 'অন্যের ক্ষতি না করে সবাই মোটামুটি ভালভাবে সুখী জীবনযাপন করতে পারা' তারা এই প্রাণিকে হয়তো কিছুটা ছাড় দিতে রাজি হবে। কিন্তু সবার প্রায়োরিটি লিস্ট এক নয়। কারও কারও প্রায়োরিটি লিস্টে আছে 'নিজের বা অন্যের জীবনের বিনিময়ে হলেও কিছু নৈতিক মানদণ্ডকে টিকিয়ে রেখে যাওয়া'। ফলে নিরন্তর দ্বন্দ্ব চলতেই থাকবে। আর এজন্যই প্রকৃতির সন্তান এই নিছক প্রাণির সাথে নৈতিকতার বোঝাপড়া হয়ত চিরকালই এক দুর্বোধ্য প্রশ্ন হয়ে থাকবে।

জেনেটিক্স
জীবনের রহস্যময় বিজ্ঞান

তোফায়েল আহমেদ
শাখা কর্মকর্তা, অডিট সেল

জেনেটিক্স হচ্ছে প্রাণের জন্ম বা সৃষ্টি কিংবা উদ্ভব এবং বিকশিত হওয়া সম্পর্কিত বিজ্ঞান। একে কেউ কেউ সুপ্রজননবিদ্যা বলেও অভিহিত করেন। জেনেটিক্সকে আমরা জিনবিজ্ঞান বা বংশগতি বিজ্ঞান বলতে পারি। জিনবিজ্ঞান জীববিজ্ঞানেরই একটি অংশ। জিন হচ্ছে বংশানুগতি নিয়ন্ত্রণের অন্যতম উপাদান। বিগত ৫০ বছরে বিজ্ঞানের কোনো ক্ষেত্রেই জেনেটিক্সের মতো এত বেশি পরিবর্তন আসেনি। আমাদের দৈহিক ও আচরণগত নানা দিকের উন্মোচন করেছে জেনেটিক্স নামের এই বিজ্ঞান। হিউম্যান জেনোম (Human Genome) প্রজেক্টের মাধ্যমে আমাদের জিনগত নানা রহস্য উন্মোচিত হয়েছে। এ অর্জন জেনেটিক্সে উল্লেখযোগ্য অর্জন বলতে হবে। জেনেটিক্সের ক্ষেত্রে অর্জিত বৈজ্ঞানিক ও প্রাযুক্তিক অগ্রগতি চিরদিনের জন্য পাল্টে দিয়েছে কৃষি, জীববিজ্ঞান, ওষুধবিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞানসহ নৃবিজ্ঞান ও ডাক্তারি সাক্ষ্যবিজ্ঞানকেও। এক জীবের ডিএনএ আরেক জীবে স্থানান্তর বা সংস্থাপন করে ওই জীবের গঠনগত ও আচরণগত বিষয়-আশয় পাল্টে দেওয়া যায়। এভাবে পাল্টে দেওয়া যায় প্রাণি, উদ্ভিদ ও ব্যাকটেরিয়াকে। চিকিৎসায় সম্ভব হয়েছে অসাধারণ অগ্রগতি। জীববিজ্ঞানের আধুনিক শাখা জেনেটিক্সের এই অসাধারণ অগ্রগতির কথা ভেবে বর্তমান একুশতম শতাব্দীকে চিহ্নিত করা হয়েছে জীববিজ্ঞানের শতাব্দী বলে।

কেন ও কীভাবে মা-বাবার কিংবা দূরাত্মীয়ের বিশেষ কিছু দৈহিক বা আচরণগত বৈশিষ্ট্য কোনো ব্যক্তির মধ্যে সঞ্চারিত হয়, তা নিয়ে মানুষের কৌতূহল কম ছিল না। মানুষের মধ্যে প্রশ্ন জেগেছে, কেন বংশানুক্রমে এসব বৈশিষ্ট্যের ধারক-বাহক হয় মানুষ? আর শুধু মানুষই বা বলছি কেন? উদ্ভিদ, পরভুক প্রাণি বা প্যারাসাইট ও আদিপ্রাণি প্রোটোজোয়ার মধ্যেও তো বর্তমান থাকে এসব বৈশিষ্ট্য। আবার ডিএনএ বা জিনগত জটিলতার কারণে এসব বৈশিষ্ট্য পরবর্তী প্রজন্ম হারিয়েও ফেলে। জীব মাত্রের ক্ষেত্রেই এটি কী করে ঘটে, সে প্রশ্নও ছিল মানুষের মধ্যে। এ বিষয়টি মানুষকে বিস্ময়াভিভূত করেছে, দ্বিধাদ্বন্দে ফেলেছে হাজার হাজার বছর ধরে। এক সময় মানুষ জানতে পারে, প্রত্যেক জীবদেহে থাকে ডিএনএ (ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিইক অ্যাসিড) নামের এক ধরনের অণু। এই অণুই জীবের বৈশিষ্ট্য কেমন হবে সে নির্দেশ বহন করে। সে নির্দেশ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া শুরু করে এবং সেগুলোকে পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত করে এই ডিএনএ-ই। ডিএনএ কীভাবে এসব কাজ করে তা নিয়ে আলোচনা আর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আছে জেনেটিক্সে।

এ বিষয়ে নানা পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে বেরিয়ে এসেছে Pangenesis থেকে Lamarckism পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য নানা হেরিডিটি থিওরি বা বংশগতি তত্ত্ব। প্যানজেনেসিস হচ্ছে বংশগতির একটি হাইপোথেটিক্যাল মেকানিজম বা প্রকল্পিত বন্দোবস্ত। এ মেকানিজমে কোষগুলো পার্টিকেল বা কণাসমূহ ছুঁড়ে মারে। আর এই কণাগুলো ছড়িয়ে পড়ে গোটা ব্যবস্থায়। বিভাজনের মাধ্যমে কণার সংখ্যা কয়েকগুণ বেড়ে যায়। আর এগুলো জমা হয় প্রজনেন্দ্রিয়ে বা অন্ডুরে। এ প্রক্রিয়ায় ডিম্বানু বা অন্ডুর মা-বাবার দেহের সব অংশের কণাগুলো ধারণ করতে পারে।

Mendelian Genetics

Augustinian Monk at Brno Monastery in Austria (now Czech Republic)

Not a great teacher but well trained in math, statistics, probability, physics, and interested in plants and heredity.

Gregor Mendel
"Father of Genetics"

While assigned to teach, he was also assigned to tend the gardens and grow vegetables for the monks to eat.

Mountains with short, cool growing season menu pea (*Pisum sativum*) was an ideal crop plant.

আধুনিক জেনেটিক্স অবশ্য অগাস্টিনিয়ান আমলের সন্ন্যাসী গ্রেগর মেন্ডেল বাগানের মটরশুঁটি গাছের বংশানুক্রম চিহ্নিত করতে সক্ষম হন। মেন্ডেল তার বাগানের মটরশুঁটি নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখলেন, তার বাগানে দুই ধরনের মটরশুঁটি বীজ রয়েছে। কিছু বীজ ছিল বিশুদ্ধ ও মসৃণ। আর কিছু বীজ ছিল কুঁচকানো। তিনি সব সময় বিশুদ্ধ মসৃণ বীজ দেয় এমন মটরশুঁটির এবং সব সময় কুঁচকানো বীজ দেয় এমন মটরশুঁটির আলাদা চাষ করলেন। তিনি এরপর দেখলেন, কুঁচকানোর সঙ্গে কুঁচকানো প্রজনন করালে কুঁচকানো এবং মসৃণের সঙ্গে মসৃণ প্রজনন করালে মসৃণ বীজ পাওয়া যায়। কিন্তু মসৃণের সঙ্গে কুঁচকানো প্রজনন করালে তখনো শুধু মসৃণ বীজই পাওয়া যায়। তখন স্পষ্ট বোঝা গেল, সুযোগ পেলেই মসৃণ হওয়ার একটা প্রবণতা মটরশুঁটির মাঝে আছে। এই মসৃণ হওয়ার গুণটি একটি বাহক কণার মাধ্যমে বাবা ও মায়ের কাছ থেকে সন্তানের মধ্যে সঞ্চালিত হয়। একটি বাহক কণার মসৃণ হওয়ার গুণ এক ধরনের, আর কুঁচকানো হওয়ার গুণ আরেক ধরনের। সন্তান বাবার কাছ থেকে এ ধরনের একটি কণা পায়, আর মায়ের কাছ থেকে পায় আরেকটি কণা। প্রতিটি গুণের জন্য এমন ধরনের দু'টি কণা সবার মধ্যে থাকে। দু'টি কণাই যদি মসৃণ হওয়ার কণা হয়, তখন সন্তান নিজে মসৃণ হয়। আর দু'টি কণাই যদি কুঁচকানো হওয়ার কণা হয়, তবে সন্তান নিজে কুঁচকানো হয়। কিন্তু একটি কণা মসৃণ আরেকটি কুঁচকানো হলে তখনও সন্তান নিজে মসৃণ হয়। কারণ মসৃণ হওয়াটা একটি মুখ্য গুণ। তাই মসৃণ ও কুঁচকানো উভয় ধরনের কণা থাকলে মসৃণ হওয়ার প্রবণতাই প্রাধান্য পায়।

এ ধরনের দু'টি প্রজননের সময় চার ধরনের পরিস্থিতি হতে পারে। এক. বাবা থেকে মসৃণের কণা ও মা থেকেও মসৃণের কণা– এ ক্ষেত্রে সন্তান মসৃণ হবে। দুই. বাবা থেকে মসৃণের কণা ও মা থেকে কুঁচকানোর কণা– এ ক্ষেত্রেও সন্তান মসৃণ হবে। তিন. বাবা থেকে কুঁচকানোর কণা আর মা থেকে মসৃণের কণা– এ ক্ষেত্রে সন্তান হবে মসৃণ। চার. বাবা ও মা উভয় থেকে কুঁচকানোর কণা– শুধু এই একটি ক্ষেত্রেই সন্তান কুঁচকানো হবে। ফলে চারটি ক্ষেত্রের মধ্যে তিনটি সন্তান মসৃণ আর একটি ক্ষেত্রে সন্তান কুঁচকানো হবে। এরপর মেন্ডেল যা দেখালেন, তা আরো চমকপ্রদ। প্রজনন করার সময় তিনি বাবা ও মায়ের দু'টি গুণ এক সাথে নিয়ে দেখালেন সন্তানে গিয়ে সেগুলো কী হয়।

মেন্ডেল বিশুদ্ধ মসৃণ মটরশুঁটি গাছ ও কুঞ্চিত মটরশুঁটি গাছের বংশানুক্রমিক প্রলক্ষণ পরীক্ষা করে আবিষ্কার করেন, বেশির ভাগ বংশানুক্রমিক প্রলক্ষণ বাহিত হয় একটি ডিসক্রিট ফ্যাক্টরের (Discrete Factor) তথা অসম্বন্ধ বা বিযুক্ত বিষয়ের মাধ্যমে। পরে এই ডিসক্রিট ফ্যাক্টরেরই নাম দেয়া হয় জিন। এই কণাসদৃশ জিন বিভিন্ন গুণকে বহন করে প্রতিলিপি হওয়ার মাধ্যমে কোষ থেকে কোষে নিয়ে যায়, পরের প্রজন্মেও নিয়ে যায়। শুধু এ ধারণার ওপর ভিত্তি করে জেনেটিক্স বা বংশগতি বিজ্ঞান আরো অনেক এগিয়ে যায়। এভাবেই মানুষ জানল, জীবের পূর্ব-প্রজন্মের দৈহিক ও আচরণগত বৈশিষ্ট্য উত্তর-প্রজন্মে নিয়ে যাওয়ার সেই বাহনই হচ্ছে ডিএনএ।

ডমিনেন্ট অ্যান্ড রেসেসিভ জিন

এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে বেরিয়ে আসে জেনেটিক্সের মৌল নীতি বা তত্ত্ব। যেমন এসব পরীক্ষায় জানা যায়, বেশির ভাগ অর্গানিজম বা অণুজীবের প্রতিটি জিনে রয়েছে দু'টি করে কপি। একটি আসে প্রতিটি প্যারেন্ট থেকে, আর অপর জিন আসে বিভিন্ন জিনের আকারে বা allele-র আকারে। অ্যালিলি এক ধরনের জিন, যা নির্দিষ্ট লুকাসে একটা পর পর অস্তিত্বশীল থাকে। সুস্থভাবে বেড়ে ওঠা একটি মটরশুঁটি গাছে লম্বা দু'টি লম্বা অ্যালিলি জিন থাকে, সংক্ষেপে যাকে TT দিয়ে নির্দেশ করা হয়। আর খাটো গাছের থাকে দু'টি খাটো অ্যালিলি, যা নির্দেশ করা হয় Tt দিয়ে। তাদের সন্তানের থাকে একটি লম্বা ও একটি খাটো জিন (Tt)। এই প্রথম প্রজন্ম লম্বা হওয়ার কারণ লম্বা অ্যালিলি ডমিনেন্ট বা প্রধান।

মটরশুঁটি গাছের রেসেসিভ বা প্রচ্ছন্ন প্রলক্ষণ তখনই প্রকাশ পায়, যখন দু'টি রেসেসিভ অ্যালিলি এক সাথে মিলে। কীভাবে একই চেহারার অণুজীব বা ফেনোটাইপ অ্যালিলির (লম্বা প্যারেন্ট আর খাটো অফস্প্রিং) থাকতে পারে জেনোটাইপ অথবা জিন সম্মিলন, এটি তারই একটি উদাহরণ।

মেন্ডেলের গবেষণাকর্ম প্রকাশের ১০০ বছর পর বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেন- জিনগুলো গঠিত ডিএনএ নামের ডাবল-হেলিক্যাল (দুইবার পেঁচানো) মলিকিউল দিয়ে। আর এই ডিএনএ গঠিত আমাদের রাসায়নিক বর্ণমালা বা ক্ষার অ্যাডেনিন, থাইমাইন, সাইটোসিন ও গুয়ানিন দিয়ে। ১৯৫৩ সালে ডিএনএ কাঠামো আবিষ্কারের পর পরই ডিএনএ রেপ্লিকেশন অর্থাৎ ডিএনএ প্রতিলিপি তৈরির একটি পরামর্শ আসে।

হিউম্যান জেনোম প্রজেক্টের লক্ষ্য ছিল ডিএনএ সিকুয়েন্স বা ধারাক্রম ব্যবহার করে আমাদের ক্রোমোজমে (জীব বা উদ্ভিদকোষে থাকা সূক্ষ্ম তন্তুসদৃশ বস্তু) থাকা ৩০০ কোটি ডিএনএর সবগুলোর রহস্য উদ্‌ঘাটন করা এবং আমাদের সব জিনকে জানা। আমাদের জিনগত গঠনকে ইঁদুর, টিকা, চিংড়ি, মুরগি, কুকুর, ক্ষুদ্র কীট, ফলমাছি ও ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদির জেনোমের সাথে তুলনা করে বিজ্ঞানীরা জানতে পারেন সময়ের সাথে কীভাবে জিনের উদ্ভব ঘটে এবং এর সাথে মানুষের রোগেরই বা সম্পর্ক কী।

জেনেটিক বিপ্লবের আরেকটি শক্তিশালী প্রযুক্তি হচ্ছে Polymerase Chain Reaction (PCR)। এই Reaction এর মাধ্যমে ছোট্ট ধ্বংসপ্রাপ্ত নমুনা থেকে বিপুল সংখ্যায় ডিএনএ সিকুয়েন্স তথ্য পাওয়া যায়। পিসিআর অপরাধ তদন্তে এক অপরিহার্য উপাদান হয়ে উঠেছে। এর মাধ্যমে অপরাধ স্থলে রেখে যাওয়া রক্ত, বীর্য অথবা চামড়া (এমনকি এক দশক সময় আগে রেখে যাওয়া) পরীক্ষা করে অপরাধীদের ধরা ও নির্দোষ ব্যক্তিকে অভিযোগ থেকে রেহাই দেওয়া যায়। এই প্রযুক্তি মানুষের বংশ পরিচয় এবং অনেক প্রজাতির উদ্ভবের ইতিহাসকেই পাল্টে দিচ্ছে। ধ্বংসাবশেষ ও ফসিলের ডিএনএ পরীক্ষা করে এসব নতুন করে জানা যাচ্ছে। অন্যান্য নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করেও পিসিআরের তুলনায় আরো দ্রুত এসব প্রমাণ করা যাচ্ছে।

ডিএনএ থেকে অতীত জানা

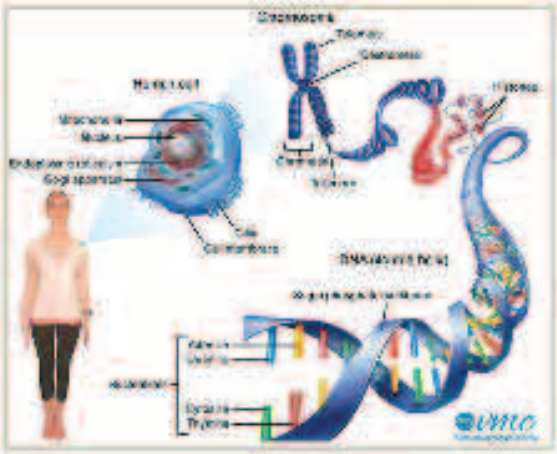

আজকের এই আমি ও আপনার মধ্যে যে ডিএনএ বার্তা রয়েছে, তা কিন্তু আপনার আমার জীবদ্দশায় সৃষ্টি হয়নি। এই ডিএনএ বংশানুক্রমে এসেছে সুদূর অতীতের আমাদের পূর্ব-প্রজন্ম তথা পূর্বপুরুষ থেকে। কাজেই আজকের প্রজন্মের মাঝে অতীতের পরিচয় থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক। ডিএনএর গঠন উদ্‌ঘাটন করে এর সিকুয়েন্সিং করতে পারার পর আমরা অতীতকে উন্মোচন করার সুযোগ পেয়েছি। আজকের মানুষের ডিএনএর মধ্যে মিল-অমিল লক্ষ করে বোঝা যায়, তাদের সবার পূর্বপুরুষেরা কত নিকট অতীত বা দূর অতীতে ছিল। কারণ, বংশধরদের মধ্যে ডিএনএর পার্থক্য দেখা যায় কালক্রমে তার বিভিন্ন জিনের ডিএনএর মিউটেশন জমতে জমতে। যত বেশি কাল অতিক্রান্ত হবে, তত বেশি এই পার্থক্য দেখা দেবে। এভাবে আমরা অতীতের দিকে যেতে যেতে আজকের ডিএনএ পরীক্ষা করে বহু লক্ষ বছর আগের যুগের কথা জানতে পারি।

ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ

আমরা এখন ব্যবহার করার মতো যে প্রাচীন ডিএনএ সংগ্রহ করতে পারছি, তা এক লাখ বছরের বেশি আগের নয়। এর আরো আগের সময়ের ডিএনএ সংগ্রহ করা যাবে কি না, তা এক কঠিন প্রশ্ন। বিষয়টি জিনবিজ্ঞানের জন্যও একটি চ্যালেঞ্জ। তবে আশা করা যায়, সে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একদিন জিনবিজ্ঞান সক্ষম হবে। আমরা একদিন অতিক্রম করতে পারব লক্ষ বছরের আজকের এই সময়সীমা। এ পর্যন্ত বেশি অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে মাইটোকন্ড্রিয়াল ডিএনএর বেলায়। নিউক্লিয়াসে থাকা মূল ডিএনএর বিশ্লেষণ বেশি সম্ভব হয়নি এর কার্যকর ডিএনএ পাওয়া না যাওয়ায়। বরফের মধ্যে পাওয়া ম্যামথের ৪০ হাজার বছরের পুরনো দেহাবশেষে নিউক্লিয়াস ডিএনএ বিশ্লেষণ সম্ভব হয়েছে। এ সময়সীমা অতিক্রম করাও জিনবিজ্ঞানের জন্য চ্যালেঞ্জ।

তথ্যসূত্র :

১. Text Book of Biochemistry with Clinical Correlation. Thomas M. Devlin; (4th Edition.) A John Wiley & Sons Inc., London, 1997.

২. Lehninger's Principles of Biochemistry. David L, Nelson and Michael M. Cox; (4th Edition.) Worth Publishers, USA, 2005.

৩. Text Book of Biochemistry. Albert L. Lehninger; (2nd Edition.) Kalyani Publishers, New Delhi, 2000.

৪. Harper's Biochemistry. Robert K. Murray, Daryl K. Granner, Peter A. Mayes, Victor W. Rodwell; (25th Edition.) McGraw-Hill, International Edition, 2003.

৫. Biochemistry. Lubert Stryer; (4th Edition.) W. H. Freeman and Company, New York, 1995.

৬. Biochemistry. Pamela C. Champe; (2nd Edition.) Lippincott-Raven Publishers, East Washington Square, USA, 1994.

রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো অনন্য বন্ধুতার উপাখ্যান

ড. মোঃ মোহসীন রেজা
সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ

১৯২৪ এর সেপ্টেম্বর। আর্জেন্টিনার লেখক সমাজে সাড়া পড়ে গেল। রবীন্দ্রনাথ আসছেন আর্জেন্টিনায়। বুয়েন্স আয়ার্স (Buenos Aires) হয়ে পেরুর পথে যাবেন। পেরুর শতবর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে যোগ দিতে। ওকাম্পো মগ্ন ছিলেন কখনো গীতাঞ্জলির ফরাসী ভাষায় আঁদ্রে জিঁদ এর অনুবাদ নিয়ে, কখনও বা রবীন্দ্রনাথের নিজের ইংরেজি অনুবাদ নিয়ে যার ভূমিকা লিখেছিলেন ইয়েটস। রবীন্দ্রনাথ পড়তে গিয়ে কী রকম একটা অস্থিরতা আবার প্রশান্তিও অনুভব করেন ওকাম্পো। সংবাদটা শোনার পর থেকেই উদীয়মান এই লেখিকার হৃদস্পন্দন গেল বেড়ে। তার বন্ধুরাও বলতে লাগলো রবীন্দ্রনাথের সাথে দেখা হওয়াটাই হবে ১৯২৪ এর সেরা ঘটনা। ওকাম্পোর মনে হলো রবীন্দ্রনাথের সাথে দেখা হওয়াটা হবে তার সারা জীবনের শ্রেষ্ঠ ঘটনা।

ওকাম্পো লেখালেখি করত বুয়েন্স আয়ার্স-এর সেরা সাহিত্য পত্রিকা La Nacion - এ Dante, Ruskin, Gandhi কে নিয়ে লেখার পর সে সময় ওকাম্পো'র চতুর্থ লেখাটা 'রবীন্দ্রনাথ পড়ার আনন্দ' তখন La Nacion এ প্রকাশনার প্রতীক্ষায়। ওকাম্পোর ভাবতে অদ্ভুত লাগে, পরপর দুটো লেখা-একটা গান্ধি, অন্যটা রবীন্দ্রনাথ- একই দেশের দুই ভিন্ন বিন্দু- যাদের দূরত্বের নেই কোনো সীমা, আবার নৈকট্যেরও ঘাটতি নেই খুব একটা- বিস্ময়কর!

১৯২৪ এর বসন্তকালটা ছিলো দারুণ। ওকাম্পোর শহর সানইসিদ্রোটা যেন গোলাপের শহর। ওকাম্পোর সকালটায় প্রথম কাজ গোলাপের গন্ধ নেওয়া। ২য় কাজ রবীন্দ্রনাথ পড়া। ৩য় কাজ রবীন্দ্রনাথ নিয়ে ভাবা। ৪র্থ কাজ রবীন্দ্রনাথ নিয়ে লেখা। ৫ম কাজ রবীন্দ্রনাথের জন্য প্রতীক্ষা করা । ওহ! এমনটা যদি হতো! কবি আমায় একটুখানি দেখা দিত! শিউরে ওঠে ওকাম্পো। ভাবে কী হবে এই শিহরণময়ীর।

আবার নিজের লেখাটা পড়লো ওকাম্পো। শিরোনাম 'রবীন্দ্রনাথ পড়ার আনন্দ' না হয়ে 'রবীন্দ্রাপেক্ষার নিদাঘ বসন্ত'-টাইপ কিছু একটা হলে মানানসই হতো। Testimonios-এ ওকাম্পো দুই মহারথী ফরাসি কবি Proust, আর রবীন্দ্রনাথকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। পাশ্চাত্যের কবি অস্থির, প্রকম্পিত। প্রাচ্যের কবি প্রশান্ত আর প্রজ্ঞার ঐশ্বর্য্যময়তায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সেতু-বন্ধনের কাজটিও করে।

৬ নভেম্বর, ১৯২৪। পত্রিকায় ওকাম্পো দেখলো রবীন্দ্রনাথ বুয়েন্স আয়ার্স-এ উঠেছেন 'প্লাজা হোটেল'-এ। ওকাম্পো বন্ধু 'এ' কে বললো- চল দেখা করে আসি। প্লাজায় রবীন্দ্রনাথের সহকারি লিওনার্দো এলমহার্স্ট বললেন, কবি সবে মাত্র ফ্লু থেকে সেরে উঠতে যাচ্ছেন। ডাক্তার জানিয়েছেন তার হার্টের যা অবস্থা, তাতে আন্দিজ পর্বতমালা পাড়ি দিয়ে পেরু পর্যন্ত যেতে পারবেন না। ওকাম্পো চাপা আর লাজুকও বটে। ওর বন্ধুকে বলে- জিজ্ঞেস করোনা, ডাক্তার বিশ্রাম নিতে বলেছে কিনা। ওকাম্পোকে অবাক করে এলমহার্স্ট জানালেন- কবিকে কিছুদিন বুয়েন্স আয়ার্স-এ বিশ্রাম নিতে হবে। বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে ওকাম্পোর। বলে, 'মি. এলমহার্স্ট, আপনার আপত্তি না থাকলে কবিকে এখানে রাখার দায়িত্বটা আমি নিতে পারি। আপনি অনুগ্রহ করেন, আর নিশ্চিন্ত থাকেন'। এলমহার্স্ট কি মনে করে রাজি হলেন। ওকাম্পোর শিরদাঁড়া দিয়ে একটা আনন্দের স্রোত বয়ে গেল। পরিস্থিতিটা বুঝে উঠতেই বন্ধু 'এ' কে বললো-এখনই বেরিয়ে পড়তে হবে বাড়ি খুঁজতে। ধুপধাপ দৌড় দিলো ওরা। এলমহার্স্ট হেসে উঠলেন দুই ঘোড়ষী'র কীর্তি দেখে।

ওকাম্পো বাইরে এসে বলে 'এমন বাড়ি পেতে হবে যা শহরের কাছাকাছি, কিন্তু কোলাহলমুক্ত। বাগান লাগবে। কি ভাগ্য আমার! রবীন্দ্রনাথের জন্য বাড়ি ম্যানেজ করবো! সেখানে সে থাকবে! সুস্থ হয়ে উঠবে! ভাবতে পারছি না!' পরদিন ওকাম্পো এলো রবীন্দ্রনাথের স্যুটে। এলমহার্স্ট গেলেন ভেতরে। ওকাম্পোর বুকের ভেতর ঢিপ ঢিপ শব্দ। ভাবছে আমি কি এমন কেউ

যার সাথে রবীন্দ্রনাথ দেখা করবে? ওকাম্পো লজ্জাও পেতে লাগলো। এমন সময় কবির আবির্ভাব।
নিরব। নম্র। সৌম্য। মাথা ঈষৎ উঁচু। পুরো ব্যক্তিত্বে একটা সার্বভৌমের অভিব্যক্তি। মসৃণ ভ্রু যুগল যেন কোনো দিন ভয় পায়নি। শ্মশ্রু মুখের নিম্নাংশ মণ্ডিত, ঊর্ধ্বাংশ জ্যোতির্ময়। উঁচু নাক। দৃঢ় অথচ কমনীয় চোখ অবনত তাতে তারুণ্য এবং আগুনের কমতি নেই। ওকাম্পোর চোখে রবীন্দ্রনাথ এক বিস্ময়কর সৌন্দর্য্য। সেই ১৯১৪ তে প্রথমবার রবীন্দ্রনাথ পড়ার সময় এবং এরপর টানা দশটি বছর অশ্রুবর্ষণের পর রবীন্দ্রনাথ এলো ওকাম্পোর দেশে। গুরুদেবের সাথে পরিচিতি পর্ব সেরেই ওকাম্পো ছুটলো ওর এক চাচাতো ভাই এর কাছে যার Miral Reo নামে একটা চমৎকার বাড়ি আছে। বাড়ি পাওয়া গেলে Miral Reo থেকে বেরিয়েই উড়ে গেল Hotel Plaza-য়। এল্মহার্স্ট বসে ছিলেন। ওকাম্পো ভেতরে ঢুকেই জানালো- দু'দিনের মধ্যে সব ঠিকঠাক। এখন ঘরগুলো পরিষ্কার করতে হবে, আর আসবাবগুলো রং করা। ওগুলো আমার দায়িত্ব। সাহায্যের জন্য একজন চাকর, আর খাওয়া-দাওয়ার জন্য বাসনপত্র পৌঁছে যাবে সময় মতো। এল্মহার্স্ট ধন্যবাদ জানালেন।

১২ নভেম্বর ১৯২৪। বিকেল ৩টায় গুরুদেবকে নিয়ে বেরোল ওকাম্পো Miral Reo-র পথে। ঝড় উঠলো। ভয়ঙ্কর ধুলোর ঘূর্ণী বইছে যত্র-তত্র। ওকাম্পো যতোক্ষণ গাড়ি চালালো ঝড়টাও ঠিক ততোক্ষণ দাপাদাপি চালালো। যেইনা বাড়ির ভেতরে ঢুকলো, অমনি সব কিছু যেন বেশি শান্ত। ওর মনের ভেতর জমাট বেঁধে আছে গীতাঞ্জলি যা ওকে কাঁদিয়েছে বহুবার। ওকাম্পো তখনও জানতো না- কে তাকে কাঁদায়- রবীন্দ্রনাথ নিজেই, নাকি তার ঈশ্বর। ঘরে প্রবেশ করলেন রবীন্দ্রনাথ। দরোজাটা বন্ধ করতেই গাঢ় নিস্তব্ধতা স্বাগত জানালো ওদের।

বাড়ির পাশের নদীটা যেন আকাশের অনুবাদক। আকাশে যা কিছু ঘটে সবই প্রতিবিম্বিত নদীর আয়নায়। আকাশের খেলা নদীতে দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথকে ওকাম্পো ঘরের ব্যালকনিতে নিয়ে এলো। নদীটা অনেক কিছু দেখাতে লাগলো ওদের। দুজনই নির্বাক দিগন্তের দিকে তাকিয়ে থাকলো- আকাশ, নদী, পৃথিবী আর মেঘ সবাই একসাথে মিলে মিশে এক বর্ণিল ক্যানভাস। ব্যালকনিটা যেন রবীন্দ্রনাথের আপন হবার প্রতীক্ষাতেই ছিলো। কবি রোজ গোধূলীতে ব্যালকনিতে বসে লাল-নীল-বেগুনী সন্ধ্যে দেখতেন নদীর বুকে। একটু দূরেই নিয়ম করে নিশ্চুপ ওকাম্পো। শব্দ উচ্চারণের সাহস হতো না; ভয়, যদি ভুল হয়ে যায়। ওকাম্পোর মনে হতো এমনি করে ব্যালকনিতে বসে নদী দেখতেন - চার্লস বোঁদলেয়ার, অন্য গোধূলীতে, অন্য কোনো নদীর কিনারে।

রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনা ছিলো Sun Isidro তে একটা সপ্তাহ বিশ্রাম নিয়েই রওয়ানা দেবেন পেরুর উদ্দেশে। ওকাম্পো বলল, গুরুদেব, ডাক্তার বলেছেন তোমার ২০ দিন বিশ্রাম দরকার। ওকাম্পোর চেষ্টা কুড়ি দিনকে একমাস পর্যন্ত প্রলম্বিত করা। ১৪ নভেম্বর ১৯২৪ এ La Nacion খবর ছাপলো রবীন্দ্রনাথ এখনও বুয়েন্স আয়ার্স-এ। পেরুর প্রেসিডেন্ট মি. লিগুইয়া রবীন্দ্রনাথকে আশা করছেন, কিন্তু অসুস্থতার কারণে রবীন্দ্রনাথ লিমা যেতে পারছেন না। ওকাম্পো দুপুরে একবার করে Miral Reo -তে আসে। দুপুরের লাঞ্চ করে কবির সাথেই। সারাদিন কাজ সেরে সন্ধ্যে হলে আবারও চলে আসে Miral Reo - তে। চা বানায় কবির জন্য। কম্পিত হাতে সাহস সঞ্চয় করে কবির দরজায় আলতো করে টোকা দিতে মনে হয় সে যেন গ্রহান্তরিক, যেন অন্য পৃথিবীর কেউ। দরজায় টোকা দেয়ার সাথে সাথেই গুরুগম্ভীর কণ্ঠ কে? বিজয়া? ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোকে এরই মধ্যে গুরুদেব 'বিজয়া' বলে ডাকতে শুরু করেছেন। তুমি বুঝি খুব ব্যস্ত ছিলে সারাদিন? ওকাম্পোর মুখে কথা সরে না। মনে মনে বলতে থাকে হ্যাঁ সারাদিন খুবই ব্যস্ত সময় কাটিয়েছি। তোমার সাথে দেখা করার উপযুক্ত সময় বের করতেই ব্যস্ত। তোমাকে কি বলবো তা ভাবতেই ব্যস্ত, আর ব্যস্ত এই ভেবে যে, তোমায় কী দিতে পারি।

একটু একটু করে এভাবে কবির কাছাকাছি চলে এলো তার বিজয়া। কবিকে দেখা-শোনার ভার পুরোপুরি ওকাম্পোর ওপর। পত্রিকায় লেখা হয়েছে- রবীন্দ্রনাথকে সম্পূর্ণ বিশ্রামে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন ডাক্তার। ওকাম্পো পত্রিকাটি এগিয়ে দেয়।

- গুরুদেব আজ থেকে তোমার ঘরে দর্শনার্থীদের প্রবেশ নিষেধ।

- আহা বিজয়া, ওদের সাথে কথা বলাটা আমার দায়িত্ব।

-তোমাকে নতুন করে অসুখে পড়া থেকে বিরত রাখাটা আমার দায়িত্ব।

রবীন্দ্রনাথ সকালে লিখতেন। পাশে বসে দেখতো ওকাম্পো। কখনও দু'জনে মিলে বাগানে একটু হাঁটাহাঁটি। দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে পাখি দেখা। তখন রবীন্দ্রনাথ হাডসন পড়ছেন। সন্ধ্যায় ভক্তদের আগমন। রবীন্দ্রনাথ বসতেন পাহাড় চূড়ার একপ্রান্তে। ভক্তরা বসতো গোল হয়ে চারদিকে। অদ্ভুত দর্শন Sophist-রা আসতে লাগলো দল বেঁধে । রবীন্দ্রনাথের চুল-দাড়ি দেখে ওরা ভাবতো তাদেরই দলের কেউ। একদিন ওকাম্পোকে এক ভদ্রমহিলা দুম করে এসেই বললো- এখনই কবির সাথে একটু দেখা করতে

চাই। স্বপ্নে হাতি দেখেছি। স্বপ্নের ব্যাখ্যাটা একটু জানতে চাই। ওকাম্পোর পিত্তি জ্বলে যায় উদ্ভট ভক্তদের উৎপীড়নে ।
- গুরুদেব, তুমি কি একজন হস্তী স্বপ্নচারিণীর স্বপ্নার্থ ব্যাখ্যায় প্রস্তুত আছো? রবীন্দ্রনাথ হো হো করে হেসে উঠলেন।
- দেখ গুরুদেব এসব হলো তোমার 'সদা অত্যধিক উন্মুক্ত কপাটনীতি'র' ফলাফল।
-হ্যাঁ হ্যাঁ বিজয়া, তা ঠিকই বলেছ। এরপর অট্টহাসি।

এক সন্ধ্যায় ওকাম্পো আর্জেন্টিনার সাহিত্যকর্মের সমসাময়িক প্রতিনিধি Ricardo-কে সঙ্গে নিয়ে এলো কবির সাথে দেখা করিয়ে দিতে। কবির আবদার অনুসারে পরদিন সন্ধ্যায় Castro Quartet-কে নিয়ে ইউরোপীয় সংগীতের আসর।
- কেমন লাগলো?
- কিছু একটা ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। আমার কাছ থেকে প্রথম বাংলা গান শুনে তোমার যা হয়েছিলো, আমার এখন সেই অবস্থা।

একদিন ওকাম্পোর বন্ধু ফ্যানি বললো,
-মি. টেগোরের গাউনটা কেমন পুরোনো হয়ে গেছে।
ওকাম্পো চিন্তিত। প্যারিসের বিখ্যাত পোশাক নির্মাতা প্রতিষ্ঠান Paquin এর একটা শাখা বুয়েন্স আয়ার্স এ আছে।
-চলো Paquin এ।
নরম উল পছন্দ করে Paquin এর ম্যানেজার এলিসকে আগের স্যাম্পল দিয়ে ওকাম্পো বললো,
হুবহু কপি করে দাও। কেউ জানবে না এখানে রবীন্দ্রনাথের গাউন তৈরি হচ্ছে।
-আমি আজীবন মুখ বন্ধ রাখবো। তারপর ইনিয়ে বিনিয়ে, তো কবে ফিটিংসটা দেখতে আসবো?
-ফিটিংস দেখার দরকার হবে না ।

এবারে প্রার্থনার ভঙ্গিতে,
-তাঁকে জীবনে একটিবার দেখার শখ। আমি শুধু গাউনটা পরিয়ে দেখবো ঠিক আছে কি না। আর শুধু তাঁর দাড়িটা ছুঁয়ে দেখার ইচ্ছে....

- আরে তাঁর দাড়ি ছুঁয়ে দেখার কী আছে!
-ছবিতে দেখে তাকে মনে হয় যিশুকে দেখছি প্লিজ!
এলিস গুরুদেবকে গাউন পরিয়ে পাশে হাঁটু গেড়ে বসে ভাঁজগুলো ঠিক করে দিচ্ছে। ওকাম্পো মজা করে,

-গুরুদেব, নট নড়ন চড়ন। মহান ঈশ্বরপুত্র যিশু বলে কথা।
-ঈশ্বরপুত্র যিশু?

- তোমার না বুঝলেও চলবে। আচ্ছা গুরুদেব, তুমি যখন ইংল্যান্ডে পড়ছিলে, নিশ্চয়ই যে কারও মাথা খারাপ করে দেবার মতো একটা হ্যান্ডসাম বয় ছিলে তাই না? ইংল্যান্ডের মেয়েরা কি সবাই মিলে তোমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিলো?
হ্যাঁ, অবশ্যই। তারপরই দম ফাটানো হাসি।
দেশে ফিরে রবীন্দ্রনাথ ওকাম্পোকে লিখেছিলেন- 'যখন আমরা একসাথে ছিলাম, শব্দ নিয়ে খেলেছি, একে অপরকে চেনার সুযোগটুকু হেসেই উড়িয়ে দিয়েছি'।

ওকাম্পো বলে-
-গুরুদেব আমার পৃথিবীতে তুমি পুরোটাই উপস্থিত। কিন্তু তোমার জগতে আমার মতো এক নির্বাক প্রাণিকে কিছুটা অনুমান ছাড়া আর কিইবা জানলে?
রবীন্দ্রনাথ উত্তর দিলো,

'আমি চিনি গো চিনি তোমারে
ওগো বিদেশিনি
তুমি থাকো সিন্ধু পাড়ে
ওগো বিদেশিনি'।

কবি আরও লিখলেন-

Thou hast made me endless
Such is thy pleasure

মার্চ ১৯৩৯। বুয়েন্স আয়ার্সে P.E.N ক্লাবের কংগ্রেস। ওকাম্পোর ইচ্ছে গুরুদেব আসুক। আবার ভাবলো, শরীর কেমন কে জানে। নিমন্ত্রণপত্র পাঠালো না। পরে গুরুদেব রেগে লিখলেন-
- আমি কি বুড়ো হয়ে গেছি? খবর পেলে ঠিকই পাড়ি জমাতাম সমুদ্রে ।

১৯৩৯ এর মার্চ। রবীন্দ্রনাথ যে কবিতাগুলো আবৃতি করে শোনাতেন ওকাম্পোকে, সেগুলিই "পূরবী" শিরোনামে প্রকাশ হয়েছে। ওকাম্পোকে লিখেছেন-
-ইচ্ছে হচ্ছে, নিজে গিয়ে বইটা তোমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে আসি। অধিকাংশ কবিতা তোমার সাথে লেখা। আশা করছি বইটি লেখকের চেয়ে তোমার সাথেই অধিককাল অতিবাহিত করবে।

তাই হয়েছে। ১৯৪১ এ কবি মারা গেলেন। ১৯৬১ তে কবির শততম জন্মবার্ষিকীতে ওকাম্পোসহ বিশ্বের শতশত কবি এলেন ভারতবর্ষে। ওকাম্পো তার বক্তৃতায় উপরের সব বিষয় ছাড়াও প্রকাশ করেছিলেন অনেক অজানা কথা। বলেছিলেন- 'আমার স্তব্ধতা কি সত্যিই তাকে বুঝিয়েছিলো আমার অন্তরের চাওয়া? আমার ভয় হয়, তা যেন না হয়ে থাকে। তাকে কখনও বুঝতে দিইনি যে তার বিদেশিনি তার কতটা আপন। কতটা নিবিড় দুই মহাদেশ। মাঝখানে যদিও মহাসাগর-

এইখানে শুধু আত্মার ইতিহাস।
কিছু নাই.....
আর কিছু নাই.....'

ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রসঙ্গ

মোহাম্মদ শওকত ওসমান
অতিরিক্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক

ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা শোচনীয় অন্ধকার যুগ, মানবতা যখন অবহেলিত-উপেক্ষিত, জুলুম-অন্যায়, অবিচার, কুসংস্কার, পৌত্তলিকতা, হত্যা-লুণ্ঠন, রাহাজানি, ব্যভিচার ইত্যাদি পাপাচারে যখন সকলেই বিভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট তখনই মহান আল্লাহ্‌র রহমতে এসব পাপাচার অনাচারের মূলোৎপাটন করে মানব জাতিকে সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ জাতিতে পরিণত করার গুরু দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে বিশ্ব শান্তি ও মানবতার ত্রাণকর্তা হিসেবে আবির্ভূত হলেন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করেন- ওয়ামা আরসালনাকা ইল্লা রহমাতাল্লিল আলামিন (আমি তোমাকে বিশ্বজগতের জন্যে রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি, সুরা আম্বিয়া-১০৭)।

প্রতি বছর আরবি রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখে আমরা পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পালন করি। ঈদ শব্দের অর্থ 'আনন্দ' এটা আমরা সকলেই জানি। 'মিলাদুনবী' শব্দের অর্থ নবীর জন্ম। আর ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী অর্থ নবির জন্মদিনের আনন্দ। যে নবি সমগ্র বিশ্ব জগতের জন্যে রহমত ও শান্তির বারতা নিয়ে এসেছেন তাঁর জন্ম আমাদের জন্যে অবশ্যই আনন্দের। তবে তাঁর জন্ম তখনই ঈদ বা আনন্দ হবে যখন আমরা তাঁর প্রকৃত শিক্ষা ও আদর্শকে ধারণ, লালন ও পালন করে, তাঁর সিরাত তথা চরিত্রকে নিজেদের মধ্যে চর্চা করতে পারব। তাঁর চরিত্রে চরিত্রবান হওয়ার চেষ্টা না করে আমরা কখনই ঈদে মিলাদুন্নবি পালনের যথার্থতা দাবি করতে পারি না।

হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততার জন্যে বাল্যকালেই 'আল-আমিন' বা পরম বিশ্বস্ত খেতাব পেয়েছিলেন। তিনি যখন ১৪/১৫ বছরের কিশোর তখন তিনি সমাজে সত্য ও ন্যায়ের সংগঠন 'হিলফুল ফুজুল' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পবিত্র কাবা শরীফে 'হাযরে আসওয়াদ' পাথর স্থাপন করার সময়ে তাঁর অসাধারণ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পরিচয় আমরা দেখতে পাই।

৬২৪ খ্রিষ্টাব্দে মদিনায় বসবাসকারী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি *Charter of Medina* বা মদিনা সনদকে ঐতিহাসিকগণ ম্যাগনা কার্টা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। মদিনা সনদের মাধ্যমে মদিনায় একটি অসাম্প্রদায়িক সমাজ তথা রাষ্ট্র গড়ে উঠে। মহানবির শান্তিপূর্ণ যুদ্ধনীতি আমাদের শিক্ষা দেয় মানুষের সৃষ্টি শান্তির জন্যে। তিনি বদরযুদ্ধে যুদ্ধবন্দীদের এই শর্তে মুক্তি দেন যে, প্রতি যুদ্ধবন্দী ১০জন শিশুকে লেখাপড়া শেখাবে।

আমরা হুদায়বিয়ার সন্ধির কথা জানি। শান্তির জন্যে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুসলমানদের জন্যে আপাত দৃষ্টিতে অপমানজনক সন্ধি করতেও পিছপা হননি। যে মক্কাবাসীর জন্যে তিনি মক্কা ছাড়তে বাধ্য হন, অষ্টম হিজরিতে মক্কা বিজয়ের সময় তিনি সেসব মক্কাবাসীকে নিঃশর্তভাবে ক্ষমা করে দেন।

মহানবী হযরত মুহম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের শিখিয়েছেন সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, সমরনীতি তথা পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা তিনি আমাদের দিয়েছেন। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমরা যদি মহানবিকে চর্চা করি আমাদের ব্যক্তি জীবনে, পারিবারিক জীবনে, সমাজ জীবনে তথা রাষ্ট্রীয় জীবনে তবেই আমরা সাফল্যের স্বর্ণ শিখরে পৌছাতে পারব। মাইকেল এইচ হার্ট তাঁর 'দি হান্ড্রেড্‌স' গ্রন্থে মহানবীকে যথার্থ কারণেই এক নম্বরে স্থান দিতে বাধ্য হয়েছেন।

বিশ্বের মানুষ আজ শান্তির অন্বেষায় ব্যতিব্যস্ত। আমরা মুসলমান জাতি মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চরিত্র ও আদর্শকে ধারণ করতে পারিনি বলেই সফল হতে পারছি না। আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা করি মহানবীর শিক্ষা ও আদর্শকে ধারণ, লালন ও পালন করার। তবেই মিলাদুন্নবি হবে ঈদে মিলাদুন্নবি তথা নবীর জন্মের আনন্দ অনুষ্ঠান হবে সার্থক।

অহনা

মোঃ রুহুল কুদ্দুস
৩য় বর্ষ, ইংরেজি বিভাগ

গত বর্ষার প্রায় শেষের দিকের এক পড়ন্ত বিকেলে মামাবাড়ীর পাশ ঘেঁষে যাওয়া শিবশা নদীর পাড়ে পা ডুবিয়ে আনমনে বসেছিলাম অনেকক্ষণ। আগে অবশ্য এখানে একটা আম গাছ ছিল যার সাথে জড়িয়ে ছিল আরও অনেক স্মৃতি। ভাটার টান পড়া স্রোতের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ মনে পড়ল অহনার কথা। বয়সে ও আমার বছর কী দেড়-বছরের বড় হবে, কিন্তু তবুও ওকে সম্বোধন করতাম 'তুই' করেই। অহনা আমার মেজো-খালামনির বড় মেয়ে। আমার মা, নানাভাই-নানুর বড় সন্তান। আর আমার খালাতো ভাই ইমরানের মা ছিলো তাঁদের ছোট মেয়ে। মা-খালাদের তিনজনের মধ্যে মেজ-খালারই আর্থ-সামাজিক অবস্থা খারাপ ছিল। তার অবশ্য একটা কারণও আছে। খালামনি, নানাভাইয়ের অমতে বিয়ে করেছিল পাশের গ্রামের এক গরিব-গৃহস্থের ছেলেকে। সেই থেকে নানাভাই খালামনির মুখতো দেখেনই না, পারতঃপক্ষে অহনার মুখও দেখতে চান না। নানু অবশ্য মেনে নিয়েছিলেন বিয়েটা, মা-ও বেশ সমর্থন দিয়েছিলেন।

অহনা বাংলাদেশি মেয়ে হিসাবে মোটামুটি লম্বা, ছিপছিপে, শ্যামলা বর্ণের, আর চোখের মনিতে ছিল নীল আভা। তবে চুলগুলো কেমন যেন এলোমেলো হয়ে থাকতো। ওর নামের সাথে ওর কাজেরও খুব মিল ছিলো, সেটা অবশ্য পরে অনুধাবন করতে পেরেছিলাম। ওর শারীরিক গঠনে হালকা সমস্যা ছিলো, মুখটা ছিল স্বাভাবিকের চেয়ে কিছুটা বাঁয়ের দিকে আর ঘাড়টা কিঞ্চিৎ ডানে হেলে থাকত। তাই, কথা বলতে ওর যেমন সমস্যা হতো, ঠিক তেমনি যে শুনত, তারও বুঝতে কিছুটা সময় লাগতো। অনেকেই বিভিন্ন সময় কথা বুঝতে সমস্যা হওয়ায় বিরক্তবোধ করত। তবে আমার কখনও মনে হয়নি যে, এই সমস্যা তার সৌন্দর্যকে কমাতে পেরেছিল। নানুর মনে অবশ্য ওর জন্যে একটু বেশিই দুর্বলতা কাজ করতো সবসময়। মাঝেমাঝে আমার মনে হতো সুন্দর নকশা করে নানুর পাকা চুলগুলো বেঁধে দিত বলেই নানু হয়তো ওকে একটু বেশিই আদর করতেন।

নানাভাইয়ের সাথে মুখ দেখা-দেখি বন্ধ হলেও নানাবাড়ি যত-রকম উৎসব অনুষ্ঠান হতো, নানুর কল্যাণে মেজো খালামনি সপরিবারেই দাওয়াত পেতেন। আমাদেরও, বাবার ব্যবসায়িক ব্যস্ততা থাকার কারণে, বিশেষ কোনো অনুষ্ঠান ছাড়া যাওয়ার সুযোগ হতো না। সেই অনুষ্ঠানগুলোতেই মা-খালামনিদেরও দেখা হত একে অন্যের সাথে। আর আমরা মামাতো-খালাতো ভাই-বোনেরাও একে অন্যের খোঁজ-খবর পেতাম, অনেক হাসি-তামাশা চলত। নানাবাড়ি এলে মা বাইরে বেশি ঘুরতে যেতে দিত না বলে, ঘরোয়া খেলা যেমন : দাবা, লুডুই বেশিরভাগ খেলতাম সবাই মিলে। দাবায় আমরা অহনার সাথে জিততে পারতাম খুব কম, আর যেগুলো জিতেছি তা-ও মনে হয়েছে ওর খেলার প্রতি উদাসীনতায় জিততে দিয়েছে আমাদের। তবে, লুডু খেলায় যে ভাগ্যের দরকার ছিলো, তা ছিলো না বলেই হয়তো এই খেলাটায় খুব বেশি সুবিধা করতে পারত না ও।

নানাবাড়ির উঠানটা ছিলো বেজায় বড়। পশ্চিম দিকটায় ছিলো একটা ফুল-বাগান, আর উত্তর-দক্ষিণ দিকে বয়ে গেছে শিবশা নদী। সেখানেই ঘাট করা হয়েছিল বাড়ীর মানুষের ব্যবহার উপযুক্ত করে। ঘাটটা ছিলো নানাভাইয়ের ব্যক্তিগত নৌকারও-ঘাট। আমরা গল্প করতে-করতে প্রায়ই ফুলবাগানের ওপাশটা থেকে গিয়ে ঘাঁটের পাশের গরান গাছের মোটাগুড়ি দিয়ে বানানো বেঞ্চিটাতেও বসতাম।

গল্পে গল্পেই একদিন শুনেছিলাম অহনা নাকি ক্লাসে ২য় হয়েছে। ব্যাপারটা আমার কাছে কেমন যেন ঠেকল। কারণ, এ পর্যন্ত কখনোই শুনিনি যে, ও-ক্লাসে প্রথম ছাড়া ২য় হয়েছে। তাই, হঠাৎ ঘটা এই ঘটনার কারণ জানতে চাইলে ওর জড়ানো কণ্ঠে বলল, "আমি ফার্ষ্ট হইলে খাদির পড়ালেখা শেষ হইয়া যাইতো"। মানে, ওর ক্লাসে যে ২য় ছিল সম্ভবত নাম ছিল খাদিজা, তাকে হয়তো তার মা-বাবা ভয় দিয়েছিল, যদি সে প্রথম না হতে পারে তবে তাকে বিয়ে দিয়ে দিবে। সেকথা শুনে ওর

ভীষণ-মায়া হয়, আর তাই অহনা গিয়ে ১০০-নম্বরের গণিত পরীক্ষায় ১০-নম্বরের উত্তর না দিয়েই খাতা জমা দেয়। একথায় তার মুখে কোনো আফসোসের চেহারা দেখলাম না। ওর কথা শুনে আমিও যার-পর নাই রকমের অবাক হলাম।

এতগুণ থাকা সত্ত্বেও দেখতাম মামাবাড়ীর অনেকেই অহনার সাথে বড়ই নিষ্ঠুর আচরণ করতো। যার পিছনে বড় ইন্ধন যোগাত ছোট-খালামণি। কারও মেজো খালামণিকে খোঁটা দিতে ইচ্ছে হলেই অপয়া, প্রতিবন্ধী, ডাইনি ছাড়াও যা-তা বলে বিনা কারণে অহনাকে সম্বোধন করত যাতে এক ঢিলে ঢিলে দুই পাখি মারা যায়, খালামণিও কষ্টপাবে সেইসাথে অহনাও। এতে হয়তো একটা পাশবিক মজা পেতো তারা। নানাভাইয়ের সামনে সকালে অহনার যাওয়া-মানা ছিল। নানাভাই বলতেন, সকালে বিকলাঙ্গ দেখলে নাকি পুরো দিনটাই খারাপ যায়। মেজো-খালামণি কিন্তু সবাইকেই অনেক ভালবাসত, বিশেষ করে নানাভাইকে, সেই নানাভাইয়ের এমন ব্যবহারে খালামণি যে কত মুখ-লুকিয়ে কেঁদেছেন তার হিসাব নেই।

নানাভাই আর বাড়ির অন্যান্যদের ব্যবহার এমন হলেও নানু চেষ্টা করতেন বিষয়গুলোকে মিটিয়ে দিতে। বয়সে ছোট হলেও আমাদের মধ্যে ইমরান ছিল দুষ্ট প্রকৃতির। অহনাকেও দেখতেই পারতোনা। সুযোগ পেলেই অপমান করতো বিভিন্নভাবে। সেবার ইমরান নানাভাইয়ের মানিব্যাগ চুরি করে ফেলে। ব্যাপারটা আমি তখনই আঁচ করতে পেরেছিলাম। পরে অবশ্য একদিন গোপনে আমার কাছে ও স্বীকার করেছিলো সেকথা। কিন্তু, চুরি সে করলেও ফাঁসিয়ে দেয় অহনাকে। অহনা চুরি করেছে বলে এ বাড়ির কেউ কোনোদিন শুনেছে বলেও মনে হয়না। তবুও এ চুরির ঘটনা যেন সবাই চোখ-বন্ধ করে বিশ্বাস করে নিলো। আর্থিক সঙ্কট থাকলেও আমি কখোনো মেনে নিতে পারিনি যে মেজো-খালামণি বা অহনা কখনও এমন করবে। আমি বললাম, একাজ তো ইমরানও করতে পারে! সবাই একসাথে বলে উঠল, "না! এতো অসম্ভব।" নানাভাই আমার কথা শুনেই ক্রোধে ফেটে পড়লেন, মা আমাকে অন্য দিকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। নানু সে যাত্রায় নানাভাইকে বুঝিয়ে শুনিয়ে নিরস্ত করতে পেরেছিলেন। যদিও অহনাকে ভর্ৎসনা করতে বাদ গেলো না কেউ।

যতই শারীরিক বাধা থাকুক না কেন, অহনার মনোবল আর মনের উদারতা ছিল সেই বাধারও অনেক উর্ধ্বে। ও সাঁতার পারত, তাই সুযোগ পেলেই অন্যকে সাঁতারের প্রাথমিক-জ্ঞান দেয়াটা তার অঘোষিত দায়িত্ব মনে করতো। অন্য সবার মতোই ইমরানকেও সে সাঁতার শিখিয়ে দিতে চায়। আমার ধারণা ইমরান এমনিতেই রাজি হতোনা, কিন্তু ছোট-খালামণি এসেই ব্যাপারটাকে আরো নোংরা করে ফেললেন। তিনি বলে বসলেন "সাঁতার শেখানোর নাম করে আমার ছেলেটাকে যে তুই গাঙের পানিতে ডুবিয়ে মারার ধান্দা করছিস, তা-কি আমি বুঝিনা মনে করেছিস"? কথাটা বলেই ফোঁসফোঁস করতে করতে ইমরানকে নিয়ে ছোট-খালামণি ঝড়ের বেগে চলে গেলেন। সেই থেকে নদীর ঘাটে যাওয়াই বন্ধ করে দিলো বেচারি মেয়েটা। কারণটা কি রাগ, ক্ষোভ, লজ্জা না অপমান তা আর জানা হয়ে ওঠেনি।

২০১০ সালের মে-জুনের দিকে আমি তখন নবম শ্রেণিতে পড়ি, সেবারও নানাভাই বাড়িতে অন্যান্যবারের মতো বিরাট এক মিলাদ-মাহফিলের আয়োজন করেছিলেন। দুই খালামণিই অনুষ্ঠানের দুইদিন আগেই পৌঁছে ছিলেন নানাবাড়ি। কিন্তু, বাবা ব্যবসার কাজে কিছুদিন ঢাকার বাইরে থাকায়, মা আগেই ফোন করে নানুকে জানায় যে আমরা যাচ্ছি না। সেবারই ঘটল এক দুর্ঘটনা। ফোনে দুর্ঘটনার খবরটা পেয়েই মা কালক্ষেপণ না করে আমাকে নিয়ে বড় ভাইয়ার সাথে, তার গাড়িতে করে তৎক্ষণাৎ রওনা হয়ে গেলেন নানাবাড়িতে। গিয়ে দেখলাম পুরোবাড়ি থমথমে, মেজো-খালামণির চোখ দিয়ে অঝরে পানি ঝরছে। ছোট-খালামণিকে আশেপাশে কোথাও দেখলাম না। নানুর চোখে তখনও দীর্ঘ-কান্নার রেশ রয়ে গেছে। ওনার কাছ থেকে পুরো ঘটনা সম্পর্কে যা জানতে পারলাম তা এরকম:

বর্ষার সময় হওয়ায় প্রতিবারের মতোই ভারী বর্ষণে আর স্রোতে ভেঙ্গে যাচ্ছিল শিবশা নদীর পাড়। ঘাঁটের পাশের আম গাছটার গোঁড়া ভাঙ্গনে নড়ে গেছিল অনেক আগেই আর ভারী বর্ষায় মাটিতে ফাটলও দেখা দেয়। ঝড়-বৃষ্টির দিনে ঝরে পড়া আম-কুড়ানো গ্রামে একটা মজার বিষয়। তো, এমনি এক বৃষ্টির সময় ইমরান আমাদের আরো দুইজন মামাতো-ভাইদের নিয়ে ঝড়ের মধ্যেই আম কুড়াতে বেরিয়ে পড়ে। যখনই আম কুঁড়াতে-কুঁড়াতে ঐ আমগাছের গোঁড়ায় পৌঁছে, তখনই আমগাছসহ পাড় ভেঙ্গে চোখের পলকেই নদীতে তলিয়ে যায়। অন্য দুইজন সাঁতার জানলেও ইমরান তো আর জানতো না! তবু নদীর এমন তেজী স্রোতের সাথে ওরাও পেরে উঠছিলনা। যেহেতু, বৃষ্টির দিন ছিল, ওদের চিৎকার অহনা ছাড়া কারো কানে যায়নি। চিৎকার শুনে, কালবিলম্ব না করেই ও ছুটে ঝাঁপ দেয় নদীতে। ঠিক সেইসময়, পাশের-বাড়িতে গিয়ে নানু আর দুই খালামণি বৃষ্টিতে আটকে গিয়েছিলেন। আর, বাড়ির অন্য মানুষগুলো তাদের দীর্ঘদিনের স্বভাবগত-বদঅভ্যাসের কারণে ওর চিৎকারের বিষয়বস্তু নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়নি। অহনা গিয়ে প্রথমে ইমরান আর তারপর অন্য-দুজনকে ঠেলে পাড়ের দিকে পাঠাতে পারলেও নিজে আর পাড়ের দিকে আসতে পারেনি, নদীর গভীর পাঁকে পড়ে, মুহূর্তেই ডুবে যায় জোয়ারের রাক্ষসী ঘোলা পানির স্রোতে।

নদীর পাড় ধরে কয়েক মাইল জুড়ে ১-২ দিন খুঁজেও পাওয়া গেলনা অহনাকে। মিলাদটা অবশ্য বন্ধ হয়নি, কিন্তু মেজো-খালামণি থাকেননি সেই পর্যন্ত, খালু এসে কারও সাথে কোনো কথা না বলে খালাকে পরদিনই নিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর থেকে আর কখনোই মেজো-খালামণিকে দেখা যায়নি নানাবাড়িতে। অহনার হারিয়ে যাওয়াটা আমার, আমার মায়ের বা নানুর যতই খারাপ লাগুক না কেন, বাড়ির বেশিরভাগ মানুষের ক্ষেত্রেই ব্যাপারটা বিশেষ হৃদয় ভঙ্গের কারণ হলো না। বরং অনেকের কথায়তো মনে হলো, এমনটা হওয়ায় যেন কোনও ঝামেলা থেকে মুক্তি পাওয়া গেছে অথবা এতে কষ্ট পাবার কিছুই নেই। মেজো-খালামণি চলে যাওয়ার পর, ছোট-খালামণির কথায় মনে হচ্ছিল ইমরান ও অন্যদের আম কুঁড়াতে যাওয়ার পিছনেও অহনার দোষ আছে আর ওদের উদ্ধার করতে যাওয়াটা একান্ত ওরই দায়িত্ব ছিল! নানাভাইয়ের কাছেও ঘটনাটা খুব বেশি গুরুত্ব পেল না। উপরন্তু, মনে হলো অহনার থেকে ঘাটের আম গাছটা ডুবে যাওয়াটাই যেন বেশি ক্ষতির ছিল। অনেককে আবার বলতে শুনেছিলাম,"মায়ের পাপ মেয়ে মোচন করল আর কি"!

এই ঘটনা আর নানাবাড়ির ও আশেপাশের মানুষদের মানসিকতা দেখে আমি প্রায় তিন বছর নানাবাড়ি যাইনি। পরে মামারা সম্পত্তি ভাগ করে নিজেদের বাড়ি বানানোর পর গিয়েছি আবার। কিন্তু, তবুও নানাভাইকে আর ছোট-খালামণিকে আমি প্রচণ্ড সম্মান আর সম্ভ্রমের সাথে এড়িয়ে চলি। একদিন গুগলিং করতে করতে জানতে পারলাম অহনা নামের অর্থ- আলোকিত অন্তর, অমর বা Angle, সত্যিই ও অহনা নামের মান রেখেছে। আর এখানে ঘুরতে এলেই পা ডুবিয়ে আনমনে বসি কিংবা পাড়ে হাঁটতে থাকি। কে জানে হয়তো কখনো আবার খুঁজে পাবো অহনাকে!

কল্পলোকে অবন্তি

সৈকত সরকার
এমবিএ প্রফেশনাল প্রোগ্রাম, ব্যাচ-১৫

মেয়েটা অবন্তিকা, অবন্তি বলেই ডাকি।

২০১২ সালের জুলাই মাস। ঈশ্বরগঞ্জ বাসস্ট্যান্ডে অবন্তির সাথে আমার প্রথম পরিচয় । ঈশ্বরগঞ্জ ময়মনসিংহ থেকে প্রায় ৩০-৪০ মিনিটের পথ। আমি তখন সৈয়দ নজরুল ইসলাম কলেজের ছাত্র। সেদিন ছিলো বৃহস্পতিবার, তাই আমার গন্তব্য কিশোরগঞ্জ; গ্রামের বাড়ি ।
চারদিকে লোডশেডিং, ভালো বাস না পাওয়ায় শ্যামল ছায়া নামক একটা লোকাল বাসেই রওনা দিয়েছি। রাত তখন ৯ টা বাজে হয়তো, ফাঁকা রাস্তা, ব্যাঙ আর ঝিঁঝি পোকার ডাক চারদিক মাতাল করে তুলেছে। আর বাসের গ্লাস বেয়ে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি যেন তাল মিলিয়ে যাচ্ছে।
রাস্তা ভাঙা প্রায় কয়েক কিলোমিটার, পায়ে হেঁটেই পথচলা কঠিন হবে, তার উপর আবার বৃষ্টি।
ঈশ্বরগঞ্জে তিনজন প্যাসেঞ্জার নামলো, বাসে প্যাসেঞ্জার বলতে আমি আর বৃদ্ধ এক লোক, দেখে মনে হচ্ছে অফিস করে বাসায় ফিরছেন।
দুজন প্যাসেঞ্জার নিয়ে তো আর একটা লোকাল বাসের এতো দূরের পথ পাড়ি দেয়া সম্ভব না,
তাই কন্টাকটারকে ডেকে বললাম :

-ভাই রাস্তায় এভাবে না থামিয়ে স্টপিজ গুলোতে কয়েকমিনিট দাঁড়িয়ে প্যাসেঞ্জার খুঁজলে ভালো হতো না? খালি রাস্তা, চোর ডাকাতেরও তো ভয় আছে।

ইহানো কতক্ষণ খারাইয়াম, আফনে চা পানি খাইলে খাইতে পারেন, সামনে একটা দোহান আছে।
ধন্যবাদ জানিয়ে নিচে নামলাম, কনকনে বাতাস আর মৃদু মৃদু বৃষ্টি যেনো হৃদয় ছুঁয়ে যাচ্ছিলো।
দোকানের বেঞ্চিতে বসলাম, এক চাচা হ্যারিকেনের আলোয় চা বানাচ্ছেন, চারদিকে ব্যাঙ আর ঝিঁঝি পোকা যেনো পাল্লা দিয়ে ডেকে চলছে, তারসাথে কাঁদা মাটির গন্ধ তো আছেই।
চাচা গরুর দুধের চা হবে?
গরুর দুধ কই পামু বাজান, কনডেন্সড মিল্ক ডিব্বা আছে, দিয়াইম?
দেন, কাপ টা ভালো করে ধুয়ে দিয়েন।
চাচা গরম পানি দিয়ে কাপটা ধুয়ে বেশি চিনি দিয়ে এক কাপ চা বানালো, যদিও আমি চায়ে চিনি কম খাই, সেটা ব্যাপার না, এই বৃষ্টির দিনে চা খেতে পারছি এটাই অনেক বেশি।
হাতঘড়িটার দিকে তাকালাম, রাত ১০.১০ মিনিট, এবার বাসে ফিরা যাক, মা হয়তো খাবার নিয়ে বসে আছে, কখন ফিরবে তার ছেলে! কিন্তু রাস্তার যা অবস্থা, পৌছাবো কি করে! ইস্, ট্রেনে গেলেই কতো ভালো হতো, মা বলেছিলো ট্রেনে আসতে! কী আর করা-

সামনে এগুতেই দেখলাম,
লাল জামা পড়ে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে একটা মেয়ে

দেখেও পাশ কাটিয়ে চলে গেলাম, বাসে উঠতে যাবো তখন মনে হলো নির্জন অন্ধকার রাস্তায় একা একটা মেয়ে! ভুল দেখলাম না তো?
এক্সকিউজমি, হ্যালো শুনতে পাচ্ছেন? একা বৃষ্টিতে ভিজছেন যে?

আমাকে কিছু বলছেন?

হ্যাঁ। একা এই রাতে বৃষ্টিতে ভিজছেন যে? কারো জন্য অপেক্ষা করছেন? দোকানের ভিতর দাঁড়ান-

মেয়েটা আমার দিকে কতক্ষণ তাকিয়ে রইলো, উপরে নিয়ন বাতি না থাকলেও চাঁদের আলোয় স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে তার সুদীপ্ত মায়াবী চোখ জোড়া কিন্তু সে কোনো উত্তর দিলো না।

আপনি কি কারো জন্য অপেক্ষা করছেন?

এবারো সে উত্তর দিলো না।

না এভাবে সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না, ঐদিকে বাস হর্ন দিয়ে যাচ্ছে, আমি চললাম বাসের দিকে। কিন্তু পা চলছে না, বলা যায় নাম না জানা মেয়েটার চোখের প্রেমে পড়ে গেছি আমি তার উপর আমার তরুণ বয়স, প্রেম হয়ে উঠেনি, সুযোগ আর এই অবস্থায় একটা মেয়েকে একা ফেলে চলে যাওয়া ঠিক হবে না।
কন্টাক্টার ভাই, আমি যাবো না, আপনি চলে যান, ড্রাইভার গাড়ি টান দিলো।

আশপাশে আর কোনো গাড়ির চলাচল নেই, এক দুইটা বাইক যাচ্ছে তার ঘন্টা দেড়েক পরপর।
আমি যাবো না
ভাবলাম একা রাস্তায় আপনি
চলে যেতেই পারতেন, হয়তো এখন আর বাস নাও পেতে পারেন, এটাই লাস্ট ট্রিপ ছিলো।
ব্যাপার না, এই এলাকাতেই আমার একটা বন্ধুর বাসা আছে, খুব সমস্যা হলে এখানেই থাকবো
সরি, আমি মাকে একটা ফোন দিয়ে নিচ্ছি!

হ্যালো মা, রাস্তা খুব খারাপ, এই রাতে ল্যাপটপ, মোবাইল নিয়ে আসা ঠিক হবে না, আমি ঈশ্বরগঞ্জ নেমে গেছি, রাতে কৌশিকদের বাসায় থাকবো, কাল সকালে রওনা দিবো।

আপনি আপনার মাকে মিথ্যা বলেছেন?
মিথ্যা কোথায়? রাত তো সবটাই বাকি, কি হবে তা তো জানি না। তার আগে বলেন আপনি এতো রাতে এখানে? কোথাও যাচ্ছিলেন?
হ্যাঁ,
ও কোথায়?

সিলেট, ঘুরতে-

বাস কি পাবেন বলে মনে হয়? এই সময়!

না।

আপনার সাথে কেউ আসেন নি? একাই এতো দূরের পথ যাবেন?

যাবো না, ইচ্ছে ছিলো। আমার বাবা আসবেন, বাবার জন্য অপেক্ষা করছি।

হুম, আমি কি আপনাকে বাসা পর্যন্ত পৌছে দিবো?

ধন্যবাদ সে আবার আমার দিকে তাকালো, মায়াবী এক জোড়া চোখ আর গালে এক টিমটি হাসি, হৃদয় চুরমার হয়ে যাচ্ছে না

আমি সৈকত, আপনার নাম কি জানা যাবে?
অবন্তিকা, সবাই অবন্তি বলে ডাকে
ঐদিকে চা দোকানের চাচা দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফিরছেন, আমি আর অবন্তি এই মহাসড়কে একা, চাঁদের আলোয় গল্প করে যাচ্ছি, বলা যায় আমার ইন্টারেস্টেই।

চাচা চলে যাওয়ার পর বেঞ্চ টান দিয়ে ডোবার পাশে দু'জন বসলাম, খুব পাশাপাশি, চাঁদের সৌন্দর্য আমাদের যেন গ্রাস করছে, কখন যে আমাদের হাত দুইটা পাশাপাশি স্থির হলো বুঝতেই পারলাম না।
অবন্তিও খুব উপভোগ করছে, আমার কথা জিজ্ঞেস করলো কোথায় পড়ি, কী করি
একটা মজার ব্যাপার হলো অবন্তি ও আমি একই কলেজের, আমি সেকেন্ড ইয়ারে আর ও ফার্স্ট ইয়ারে, সবে মাত্র ভর্তি নিয়েছে, তেমন একটা যায় নি এখনো কলেজে।

প্রতিদিন আমাদের দেখা হবে ভেবে মনটা আনন্দে ভরে গেলো,

ব্যাঙ আর ঝিঁঝিঁর তালে আমরাও গল্প করে যাচ্ছি, মৃদু বাতাস এখনো বয়ে চলেছে।

চাঁদ এবার ক্লান্ত হয়ে সূর্যকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে, সূর্য তার রূপ ছড়াচ্ছে তার যত রঙ আছে সবকয়টা দিয়ে।

কালো আকাশ ভেঙে আস্তে আস্তে লাল তারপর নীল রঙ ধারণ করা শুরু করেছে, অবন্তি আমি এখনো বেঞ্চিতে বসে। জীবনের সব গল্প যেন একরাতেই মিলিয়ে গেলো, সে তার মাথা আমার কাঁধে রেখে গল্প করছিলো, ভীষণ হাসি খুশি একটা মেয়ে।
রাতের আধার কাটতেই আমি বরং আরো অবাক হলাম! অবন্তি! চাঁদের আলো থেকেও ভয়ংকর সুন্দর, চোখ মায়াবী হরিণকেউ হার মানায়, লম্বা চুল!

না এই মেয়েকে হারানো অসম্ভব, সৃষ্টিকর্তা সত্যিই মহান, দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে আছি, মৃদু হাসছি, হাতে হাত রেখে।
সৈকত চলো-

হাতে টেনে অবন্তি বলে উঠলো

বাবা এসেছেন, পরিচয় করিয়ে দেই।

উনি আমার বাবা, আমার উপর অনেক রাগ করেছেন, উনাকে না বলে বান্ধবীদের সাথে সিলেট ঘুরতে যেতে চেয়েছিলাম, তুমি গিয়ে বলো, তুমি আমার বেস্ট ফ্রেন্ড, অনেক ভালো মানুষ তিনি।

আঙ্কেল আমি সৈকত, অবন্তির বেস্ট ফ্রেন্ড। ও ভয়ে আপনার সামনে আসতে চাচ্ছে না, সিলেট যেতে আপনি মানা করেছিলেন বলে। উনি আমার দিকে বেশকিছুক্ষণ তাকিয়ে উত্তর দিলেন ওর সাথে তোমার কীভাবে পরিচয়?
এইতো এখানেই, কাল রাতে, ও একা সারারাত আপনার জন্য অপেক্ষা করেছে, কখন নিতে আসবেন।
উনি রাস্তায় বসে পড়লেন হাউ গেড়ে, অবন্তি মা রে মা তুই কই বলে!
আমি মোটামুটি ভয় পেয়ে গেলাম, আঙ্কেলকে উঠালাম। অবন্তির দিকে তাকালাম ও মুখ চেপে কান্না করছিলো।
কিন্তু প্রতিউত্তরে যা শুনলাম তা শোনার জন্য আমি মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না।
বাবা! অবন্তি আজ থেকে এক সপ্তাহ আগে রাস্তা পার হতে গিয়ে ঠিক এইখানে এক্সিডেন্ট করে মারা গেছে, আর ফেরেনি, আর কথা হয় নি- অবন্তির সাথে!

আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না, আবারো পিছন ফিরে তাকালাম,
ও আমার পাশে, আমার কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে, বারবার ওর বাবাকে বলছে কান্না না করতে কিন্তু উনি শুনতে পাচ্ছেন না, অবিরত কান্না করে যাচ্ছেন।

আমি হতভম্ব হয়ে রইলাম, কী করবো বুঝে উঠতে পারছি না।
যাওয়ার বেলায় অবন্তি ফিসফিস করে কানে বলে গেলো- সৈকত ভালোবাসি তোমায়, প্রথম ভালোবাসা ভুলতে পারবো না কখনো, তবে চোখ বন্ধ করে ডাকলেই আমাকে পাবে এই মহাসড়কের কোনো এক গাছের নিচে চাঁদের আলোয়।

দাহকাল

ফয়সাল আহমেদ পিয়াস
অর্থনীতি বিভাগ, ব্যাচ-২০১৫

-সক্কাল সক্কাল এইগুলান কী শুরু করছস ফরিদ। সারাডা গায়ে পাক মাডি লাগাইতাচস ক্যা!!
-মা একখান ম্যাশিন বানাইতাছি! পানি পড়ার ম্যাশিন। এইদিক দিয়া পানি দিলে অইই দিক দিয়া পড়ব। মজার ম্যাশিন মা দেখ!!

গ্রামের নাম শিমুলগড়। ভোরের আলো এখানে এমনভাবে ছড়িয়ে থাকে যেন ঠিক এই কাজটা করার জন্যই সূর্যের সৃষ্টি। ঈশ্বর কিছু জিনিস এখানে ঢেলে দিতে একেবারেই কার্পণ্য করেননি, আবার কিছু কিছু জিনিস দিতে যেন তার ভীষণ আপত্তি! এই বাড়িতে ফরিদের মায়ের বিয়ে হয়েছে বছর ছয়েক হলো, সেই থেকেই শুরু একটা যুদ্ধের। যে যুদ্ধে একজন অপরাজিতা ফরিদের মা। সারাদিন অমানুষিক পরিশ্রমের সাথে মুখভরতি মলিন হাসিতে সংসারটাকে কী এক শক্তিতে আগলে রাখে তা শুধু ঈশ্বরই জানেন। ফরিদের বাবার সম্পত্তি বলতে গেলে ওই ভিটে আর একটা ভ্যান গাড়ি, তাও সেটার কিস্তি এখনও শোধ হয়নি। তার পায়ের অপারেশনে গুণে গুণে ৫০ হাজার টাকা খোয়া গেছে মাস দুই হলো। সারাদিন ভ্যান চালিয়ে যা আয় হয় তা থেকে শুধু চাল ডালের খরচটা বাদ দিলে তার পুরোটাই কিস্তির জন্য জমিয়ে রাখতে হয়। একটা ছনের ঘরে তিনজন প্রাণী কি অদ্ভুতভাবে দিনের পর দিন একটা যুদ্ধ করে যায়! এখানে সব হয়, বিদ্যুৎ গেলে জ্যোৎস্না রাতের কাঁচা গন্ধ পাওয়া যায়, এখানে বৃষ্টি হলে একটা সবুজ গন্ধে ঘর মৌ মৌ করে, অনেক কিছুরই অভাব নেই। নেই ভালবাসার অভাব। তিনজন মানুষ কী অদ্ভুতভাবে সন্তর্পণে একে অপরকে ছাড়া বাঁচে না! কী এক অসম্ভব মায়া নিয়ে রফিক মা ছেলের বেদনা দেখেন। কিন্তু এখানে কোনো দিন ভাল খাবারের গন্ধ পাওয়া যায় না, এরা কোনো দিন নতুন কাপড়ের গন্ধ পায় না। ছেলেকে কোলে তুলে বাবা বলে না, বাজান এইডা ফিন্দো দেহি, তুমারে কেমুন দেহা যায়! অথবা দিন শেষে একটা বড় মাছ কিনে এনে ফরিদের বাবা বলে না 'ফরিদের মা কই গ্যালা? এই যে ধর শুকনা মরিচ দিয়া ভর্তা ঝাল দিয়া এইডা রান্দো, বাপ ব্যাটা খাইয়া একখান ঘুম দেই"। আগেই বলেছি ঈশ্বর কিছু জিনিস দিতে বোধ হয় ভীষণ কার্পণ্য করেছেন এখানে। তবুও জীবন থেমে নেই এদের।

সাত দিন পর ঈদ। এ সময় বাজারঘাটে অনেক মানুষের যাতায়াত থাকে। বেশিক্ষণ খ্যাপ মারলে বেশি ইনকাম হয়। রফিক তাই আজকাল অনেক রাত করে বাড়ি ফিরছে, যদি দু চার টাকা বেশি আয় হয়? এদিকে ঈদের তিনদিন আগে কিস্তি দেবার তারিখ। যা জমা আছে তা দিয়ে হবে না, এখনও হাজার দুয়েক বাকি। চিন্তায় একশেষ রফিক। ঈদের আগে এত টাকা কোথেকে জোগাড় করবে রফিক? এদিকে মতি, ইদ্রিস মিয়াদের কাছ এমনিতেই ধারদেনায় ডুবে আছে। এমন কেউ নাই যার কাছে হাত পাতা যায়। সারাদিন ভ্যান চালিয়ে এই টাকা জোগাড় প্রায় অসম্ভব। তার উপরে সে অপারেশন করা মানুষ। বেশি পরিশ্রমে দুর্বল হয়ে পড়ে, শরীরে কুলায় না, এত চাপ নিতে পারে না সে।

রাতে ভ্যানে তালা দিয়ে ঘরের দিকে আগায় রফিক।

-ফরিদের বাপ আইলা নি!!
মুখটা মুছতে মুছতে ঘরে ঢোকে রফিক মিয়া।

-ডাইল দিয়া কচুর শাক ঘাঁটছি। খায়া ল্যাও!! হাত মুখ ধুইয়া আসো।
আইজকা কত হইল গো ফরিদের বাপ!!

হঠাৎ কথাটা শুনেই কপাল কুঁচকে গেল রফিকের। খিদা নাই বলে ঘর থেকে বের হয়ে কল পাড়ের দিকে আগায় রফিক। ফরিদের মার যে কথাটা জিজ্ঞেস করা উচিত হয়নি এটা বুঝতে পারল সে।

-মানুষটা সারাদিন কত খাটা খাটনি করে। ঘরে আইসা ও মানুষটার শান্তি নাই।
মনে মনে অপরাধবোধে ভোগে ফরিদের মা।

মোটামুটি ৮টা ৯টার দিকেই গ্রামের রাত হয়। শিমুলগড় জুড়ে নিথর নীরবতা। ঝিঁ ঝিঁ পোকাদের ডাকে রাতগুলো আরও রাত হয়ে আসে। এদের জীবনের রাতের সাথে এসব রাতের অনেক মিল। কোথাও একটা ব্যর্থতাকে আলিঙ্গন করে বেঁচে থাকে, নিরুপায়, তবু কত দুষ্প্রাপ্য সমাধানে নিবিষ্ট থাকা এ জীবনের আরেক নাম বোধ হয় রাত। রফিক বউয়ের পাশে এসে শুয়ে পড়ে। ফরিদ ঘুমিয়ে পড়েছে। রফিক ফরিদের মাথায় হাত বুলায়।

-ফরিদের বাপ চিন্তা কইরো না। ট্যাকা জুগাড় হইয়া যাইবো। আল্লাহ তো আছে!
রফিক উত্তর দেয় না ।

-ফরিদ বিকালে কইতাছিল একখান পাঞ্জাবি কিনা দেয়ার কথা। খ্যাম ধরছিল। আমি অরে চটকানি দিছি। পোলাডা আমার কি কান্দন ভাই কানলো!!

-কয়, মজনুর ব্যাটা ঈদের দিন নতুন পাঞ্জাবি পরবো, আমাক একখান লাল পাঞ্জাবি কিনা দেউ না মা!!
রফিক কোনো কথা বলতে পারে না। মনে মনে খুব ইচ্ছা হয় তারও ঈদে ছেলেকে একটা নতুন কিছু কিনে দিতে। প্রকৃতি যে বড় নির্মম। এই মানুষগুলোর ছোট ছোট চাওয়াগুলোই বোধ হয় বিষম এক বোঝা।

রাত বাড়ে, মিট মিট করে জ্বলতে থাকা কেরোসিন বাতির আলোটা আস্তে আস্তে কমে আসে। দুজন মানুষের না পাওয়ার ফিস ফিস গল্প আর ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাকে তখন ঘর জুড়ে অন্য এক আদিম ঘ্রাণ মৌ মৌ করছে।

-বাজান আমারে একখান পাঞ্জাবি কিনা দেউ না বাজান। দেউ না বাজান? দেউ না? বলতে বলতে হাত পা ছোঁড়াছুড়ি করে ফরিদ।

বাবা অনেকক্ষণ চিন্তা করে বলে, ঠিকাছে বাজান দিমু যাও।

ফরিদ খুশি হয়, দৌড় দিয়ে দরজা দিয়ে বের হয়ে যায়, ছেলেটার হাসি মাখা মুখ বাবার কাছে কত কাঙ্ক্ষিত, কত প্রাপ্তির!
দেখতে দেখতে ঈদের আর ৪ দিন বাকি। ইদ্রিস মিয়ার কাছ থেকে ৫০০ টাকা ধার চেয়েছে রফিক। ইদ্রিস দেবে বলেছে, তাতে কিস্তির চিন্তাটা আপাতত গেছে, কিন্তু ঈদের বাজার, সেমাই, এটা ওটা কেনা দরকার। বছরের একটা দিন এই দিনে অন্তত বউ ছেলেকে ভাল মন্দ না খাওয়াতে পারলে কিসের বাপ সে!! এই চিন্তাটা সারাদিন মাথার ভেতর ঘুরপাক খায় রফিকের, এদিকে ছেলের পাঞ্জাবি কেনার টাকাটাও জোগাড় হবে কিনা জানেনা সে।

ফরিদ তার বন্ধু রাকিবকে বলে,
-রাকিব তুই ঈদের দিন কি কিনবি রে!
-আমি তো নতুন জামা কিন্দুম। বাজান হাট থেইকা আনছে কাইল।
-কি রঙ!!
-হইলদা
-আমিও লাল পাঞ্জাবি কিন্দুম। বাজান আইনা দিব।
-তাই নাকি? তাইলে তো তরে সেই লাগবরে ফরিদ, হিরো হিরো দেখা যাইব।
-হিরো কি জিনিস!!
-হিরো মানে নায়ক, টিপির মইদ্দে দেহা যায়
-অ
-ঈদের দিন এক লগে পটকা ফুটামু। ট্যাকা আনিস
-আইচ্ছা মায়েরে কমুনে। ইস্কুলের মাঠে?
-হ ।

ছোট্ট ফরিদ ভাবতে থাকে ঈদের দিন রনি, সবুজ সবার মত সেও নতুন কাপড় পরবে। দুপুরে মায়ের কোলে দৌড় দিয়ে লাফিয়ে ফরিদ বলে,
-মা মা রনি হইলদা জামা ফিনব আর আমি লাল। আমরা পটকা ফুডামু ।
-কিহ!! কেডা কইছে তুই লাল জামা ফিনবি!!
-বাজান কিনা দিতে চাইছে!!
-বাজান তো কত কিছুই চায়রে বাপ। অহন যাহ গুসল কইরা আয়, কল পাড়ে পানি তুইলা রাখছি।
-মা আমি পুষ্কনি তে গুসল কইরব!!
-না!! বেশি কথা কবি না !! পুষ্কনি তে যাইব!!! যাহ এখান থেইকা ...

রফিক দুপুরে বাড়ি আসে। বাবাকে দেখে ফরিদ মাকে বলে মা বাজান আইছে!!
রান্নাঘর থেকে ফরিদের মা বলে, ফরিদের বাপ গুসল কইরা ল্যাও, ভাত দি!
রান্নাঘর বলতে, উঠোনে বাড়িতে ছোট্ট একটা ঘের দেয়া হয়েছে, বৃষ্টি আসলেই সব যেন মাটিতে মিশে যায়, তখন এদের কষ্টের অন্ত থাকে না।
ঘরের বারান্দায় বসে বাবা ছেলে ভাত খাচ্ছে -

-ফরিদ বলে বাজান হিরো মানে কি নায়ক!!
-হাহাহা, হ বাপ, ক্যাডা কইছে তুয়ারে?

-রাকিব কইল, আমি ঈদের দিন লাল পাঞ্জাবিডা ফিনলে আমারে নাকি হিরো দেখা যাইব!!
রফিক কেন জানি একটু থমকে যায়, খুব কষ্ট করে মুখের ভাতটা গিলে ফেলে বলে,
-হয় রে বাপ, সত্য। তুমি তো আমার হিরোই। তুমি পড়ালেখা কইরা একদিন এক্কেরে বিশাল হিরো হইবা। সামনের বছর তুয়ারে ইশকুলে ভর্তি কইরা দিমু, আচ্ছা বাজান!! অহন ভাত খাও।
-আচ্ছা বলে মনোযোগ দিয়ে ভাত খায় ফরিদ।

ফরিদের মা গালে হাত দিয়ে বাপ ছেলের কথা শোনে। ভেতরে ভেতরে ছেলেকে নিয়ে কত বিশাল স্বপ্ন তার!! ইস্কুলে ভর্তি করন লাগব!! জামাকাপড়, বইপত্র কত খরচখাস্তি আছে। আর দশটা বাবা মায়ের মত ছেলেকে পড়াশোনা করিয়ে অনেক বড় করতে চাওয়া বোধ হয় এই মানুষগুলোর জন্য অনেক দোষের কিছু।
-মা কিস্তির মাস্টার আইছে। চাচি তুয়ারে ডাকে!!
রান্না ঘর থেকে কথাটা শুনতে পায় ফরিদের মা।

রফিক ইদ্রিসের দেয়া ৫০০ আর জমানো টাকা সকালে তাকে দিয়ে গেছে কিস্তি দেওয়ার জন্য। ঈদের দুই দিন আগে সে একেবারে শূন্য, কানাকড়িও অবশিষ্ট নাই। আজ আর যা আয় হবে তা দিয়ে না হয় বাজারঘাট হবে। কিন্তু ফরিদের পাঞ্জাবী নিয়ে সমস্যা। রফিক সারাদিন ভ্যান চালায়, দুপুরে বাড়ি ফেরে না, মজুমদারের দোকানে হাল্কা খেয়ে দিনভর ভ্যান চালায়। পাঞ্জাবি যদি না কেনে তাহলে ছেলের মুখের অবস্থা ভেবে রফিকের মন খারাপ হয়ে যায়। ওইদিন অনেক কষ্ট করে কিছু আয় হল। রাতে বাড়ি ফিরে যখন ফরিদের মাকে জিগ্যেস করল,
-ফরিদ খাইছে নি!!
-হ খাইছে!! তয় পোলাডার গায়ে হাল্কা জ্বর জ্বর করতাছে!!
-রিপনের বাড়িত থেইকা ওষুধ আইনা খাওয়াছি!! খায়া অখন ঘুমাইতাছে।
-কই দেহি!! বলে ফরিদের কপালে হাত দেয় রফিক ।
জ্বর কম এখন। ছেলের দিকে তাকিয়ে মায়া হয় রফিকের। মনে হয় তার জীবনের একমাত্র সম্বল এই শিশুটি। বেঁচে থাকাই শুধু ফরিদের জন্য।

-আমারে খাওন দ্যাও ফরিদের মা, খিদায় প্যাট বিষ করতাছে। সালুন কি আইজকা?
-খাইতে বইসাই দেখ! আইজ বেগুন পুড়া ভর্তা, আর কালাই এর ডাইল রানছি। তুমার পছন্দের সালুন।
খেতে খেতে রফিক ফরিদের মাকে জিগ্যেস করে, পাঞ্জাবির কথা ফরিদ আবার বলেছে কিনা!!
-হারাডা দিন জ্বালায়া মারতেছে!! আর কইতাছো কইছে কিনা?

মুখ তুলে ফরিদের মায়ের দিকে তাকায় রফিক। কি একটা ভাবে!! তারপর বলে,
-শুনো ট্যাকা না হইলে ঝামেলা করতে যাইয়ো না, অত পিরিত নাই, আমারে চেয়ারম্যান বাড়িত ঈদের দিন সকালে কামে ডাকছে, কইছে শাড়ি কিনা দিব। আমার শাড়ি লাগব না ট্যাকা লমু অইডা দিয়া পাঞ্জাবি কিনা যাইব। তুমি সেমাই ট্যামাই কিইনও আর পারলে গোশত কিইনো। অত চিন্তা করতে যাইয়ো না।

-না ফরিদের মা তুমি শাড়িই লইয়ো। তাছাড়া তোমার কি ইচ্ছা করে না বছরকার দিন লতুন কিছু ফিন্তে। আমার পোলার জিনিস আমি কিনুম নে।
-না, তোমার অত কষ্ট করন লাগব না।
-বেশি কথা কইয়ো না।
-এহ নিজের পোলা? আমি বোধ হয় পরের বউ!!

মন খারাপ হয়ে যায় রফিকের। এই মহিলা দিনের পর দিন পুরনো একটা জীর্ণ শাড়ি পরে থাকে, অথচ কোনোদিন স্বামীকে কিছু মুখ ফুটে বলে না। কথাটা শুনে নিজেকে পৃথিবীর সবচেয়ে ব্যর্থ একটা আঁস্তাকুড় মনে হয় তার।
-ফরিদের বাপ!! মন খারাপ কইরো না। আমি ওই কথা কইতে চাই নাই। ভুল বুইজ্জো না।
-তোমার নিজের ও তো ভাল একখান কাপড় নাই।
-আমার কিচ্ছু লাগবো না। একদিন যখন সব ঠিক হয়া যাইব! তখন কিনন যাইব।
রফিক কোনো কথা বলে না...
হাত ধুয়ে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে।

ঈশ্বর সব কিছু দেখেন, বোঝেন কথাটা মাঝে মাঝে খুব মিথ্যে এই মানুষগুলোর কাছে, কেরোসিনের আলো জ্বলা এই ছোট্ট কুঁড়ে ঘরের মানুষদের কথা ঈশ্বর শোনেন না। তবু একদিন সব কিছু তিনিই ঠিক করে দেবেন ভেবে, আবার তার উপরেই বিশ্বাস করে বেঁচে থাকে এরা।
ঈদের আগের দিন। রাত ১১টা বেজে গেছে।
রফিক এখনও বাড়ি ফেরেনি। ফরিদ "পাঞ্জাবি নিয়া বাজান কখন আইব" করতে করতে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। ফরিদের মায়ের খুব চিন্তা হচ্ছে। রফিক পাঞ্জাবি কিনতে পারেনি। বাড়িতে গিয়ে ছেলেকে কিভাবে মুখ দেখাবে ভেবে বাড়িতে ফিরতে ইচ্ছা হচ্ছে না তার। তার মনে হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে অযোগ্য বাবা সে। উপায় না পেয়ে রাতেই বন্ধু ইদ্রিসের বাড়িতে যায়। ইদ্রিস রফিকের সব কথা শুনে কিছু টাকা দেয়। টাকা পেয়েছে, কিন্তু এতো রাতে দোকানতো আর খোলা নেই। রাত ১২টার দিকে বাড়ি ফেরে রফিক।

ফরিদের মা ঘুমায়নি। স্বামীর ফেরার জন্য অপেক্ষা করছে।
-অ ফরিদের বাপ, আছিলা কই হুনি? আমি তো চিন্তা করতে করতে মইরাই গেছিলাম। পোলাডা তোমার কথা কইতে কইতে হান্দায়া গেছে।
-ফরিদের মা!! পোলার পাঞ্জাবি তো কিনতে পারি নাই। দোকান তো এহন বন্দ।
-কাইল নামাজের আগেই খলিলের বাড়িত যাওন লাগব। পোলাডারে লইয়া একলগে নামাজে যামু। অরে কিছু কইয়ো না। ঘুম থেইকা উঠার আগেই পাঞ্জাবি নিয়ামু। ছাওয়ালডারে তাক লাগায়া দিমু। খুব আনন্দের সাথে কথাগুলো বলতে বলতে কেঁদে ফেলে রফিক।
- দোকান এহন বন্দ মানে?
-আচ্ছা যাই হোক। কাইল সকালে তো হইব। তাইলেই হইব।

সকাল হয়েছে, ঘুম থেকে উঠে বাড়িতে বাবা মা কাউকে খুঁজে পায় না ফরিদ। ফরিদের মা চেয়ারম্যান বাড়িতে সকালের রান্না বান্না করতে গেছে। সকালের সেমাই রুটি সেখান থেকেই আনা হবে। সে ভেবেছে ৮টার দিকে বাড়ি এসে, ছেলেকে নতুন পাঞ্জাবিতে দেখবে তারপর সেমাই খাইয়ে ঈদগাহে পাঠাবে, তারপর আবার কাজে যাবে সে। রফিক সেই ভোরেই খলিল এর বাড়িতে গেছে, হাটে খলিলের কাপড়ের ব্যবসা। মানুষ হিসেবে সে ভালো না। গরীব মানুষকে মানুষ বলে মনে করে না। বাকিতে কিছু পাওয়ার কথাতো চিন্তাই করা যায় না। টাকাতো হাতে আছে রফিকের, তার হাতে পায়ে ধরে নামাজের আগেই দোকান থেকে একটা পাঞ্জাবি আনা লাগবে। কিন্তু খলিল বাড়িতে নাই, পাশের গ্রামে কী একটা কাজে গেছে! তবে রফিক জানতে পেরেছে

নামাজের আগেই চলে আসবে। খলিল এর উঠানে বসে তার জন্য অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেয় রফিক। পাঞ্জাবি না নিয়ে বাড়ি ফিরবে না সে। এদিকে নামাজের সময় এগিয়ে আসছে। খলিল এখনও আসে নি। বাড়িতে ফরিদের মা আছে কিনা সেটাও জানে না রফিক।

ফরিদ মাকে এদিক ওদিক খোঁজে। ছোট্ট এই বাড়িতে একা কাউকে না পেয়ে ভয় পায় ফরিদ, ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে শুরু করে। গ্রামের এদিকটা তেমন একটা বসতি নেই। সদর দরজা দিয়ে বাইরে যায় ফরিদ, সম্পর্কে এক চাচি তাকে দূর থেকে বলে, "অ ফরিদ, তুমার মা কামে গেচে গো, আইয়া পড়ব অহনি, তুমি কাইন্দ না বাপ"।

মা যে তার কোথাও চলে যায় নি এইটুকু জানতে পেরে ফরিদ কান্না থামায়। হঠাৎ রাস্তার দিকে চোখ যায় ফরিদের, ছোট ছোট বাচ্চারা লাল নীল জামা পরে ইস্কুলের মাঠের দিকে যাচ্ছে। ফরিদের মন খারাপ হয়ে যায়। সদর দরজায় মুখ লুকিয়ে সে রাস্তার মানুষ দেখে। কত মানুষ সুন্দর সুন্দর লাল নীল সবুজ জামা পরেছে। কিন্তু তার তো লাল পাঞ্জাবি কেনা হয়নি। বাবার উপর অনেক রাগ হয় তার। কিন্তু সে কাঁদে না। হয়ত চারপাঁচ বছরের এই শিশুটাও দারিদ্র্যতা কী জিনিস বুঝে ফেলেছে, নির্মম কষাঘাতকে মেনে নিয়েছে।

কিছুক্ষণ পর ঘরে যায় সে। বাক্স থেকে পুরনো, ময়লা একটা কাপড় বের করে, যেটার রঙ নীল। কিন্তু এত ময়লা জামা কিভাবে পরবে সে? কখন পরতে পারবে না ভেবেই সে সিদ্ধান্ত নেয় জামাটা সাবান দিয়ে ধুতে হবে তার। মনে মনে ভাল লাগে ফরিদের, অন্তত রঙ্গিন একটা জামাতো পরতে পারবে। জামাটা হাতে নিয়ে আস্তে আস্তে পুকুর ঘাটের দিকে আগায় ফরিদ। সেদিন পুকুর ঘাট থেকে ফরিদ আর উঠে আসতে পারেনি। অনেক চিৎকার করেও কাউকে আশে পাশে পায় নি সে ।

সকাল সাড়ে দশটা। রফিক নামাজের আগে খলিলকে পায়নি। নামাজ পড়া হয়নি, তাতে কি! খালি হাতে ফিরবে না রফিক কিছুতেই। নামাজের পর খলিল এর দেখা পায়। অনেক আকুতি মিনতি করে দোকানে নিয়ে গেছে তাকে কারণ আজ দোকান খুলতো না খলিল। ঈদের দিন সে ব্যবসা করবে না।

লাল টকটকা পাঞ্জাবি কিনে খুব জোরে ভ্যান হাকিয়ে বাড়ির দিকে আসতে থাকে রফিক। পাঞ্জাবি দেখে ছেলের খুশির কথা চিন্তা করতে থাকে ।

ছোট উঠোন ভর্তি অনেক মানুষ। কি হয়েছে বুঝতে পারে না রফিক। ভিড় ঠেলে এগিয়ে যায়। খেজুর পাতার পাটির ওপর একটা ছুটফুটে শিশুকে শুইয়ে রাখা হয়েছে। একজন মহিলা তার পাশে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে, কিছু মহিলা তাকে ধরে রাখছে। জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা করছে।
এ কোথায় এসেছে রফিক!!
এরা কারা!
এরা কি রফিকের কেউ!
শিশুটা কি রফিকের আত্মার আত্মা গোছের কেউ!
হতেই পারে না। অসম্ভব।
রফিক দেখে হঠাৎ ভিড় ঠেলে ফরিদ তার দিকে এগিয়ে আসছে
বাআআজান বলে... তার দিকে ছুটে আসছে।

-এতো দেরি করলা ক্যা বাজান?
-এতো দেরি করলা ক্যা!!
-আমার পাঞ্জাবি লাগব না
-আমার পাঞ্জাবি লাগব না

রফিক কিছু বলতে চাচ্ছে, কিন্তু অদ্ভুতভাবে সে কোনো কথা বলতে পারছে না। ছেলেকে বুকে জড়িয়ে নিতে চাচ্ছে, কিন্তু পারছে না। শরীরে কোনো শক্তি অনুভব করতে পারছে না। ফরিদতো নেই, কাকে ধরবে সে!!! বাবার ওপর যে তার ভীষণ রাগ।
রফিক এসবের কিছুই বুঝতে পারছে না, শুধু বুঝতে পারছে উঠোন বাড়ির মাঝখানে দাঁড়িয়ে লাল টকটকা একটা পাঞ্জাবি খুব শক্ত করে ধরে রেখেছে একজন পরাজিত বাবা।

পর্দার পেছনে

সৌমেন গুহ
বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ, ব্যাচ-২০১৬

ছাতিফাটা রোদ। নাভিশ্বাস বের হয়ে যাচ্ছে। তা সত্ত্বেও গাড়ির জন্যে দাঁড়িয়ে আছে সুদীপ। যে করেই হোক, সাতাশ তারিখের আগে চট্টগ্রাম শহরে পৌঁছাতে হবে। শহর থেকে দূরের এই মফস্বলে তার ভবিষ্যৎ নেই। এখান থেকে পালাতে হবে। রামগড় শহর থেকে অনেক দূরে। খুব সুন্দর পাহাড়ি জায়গা। মানুষজন কম। পাশে ভারতীয় বর্ডার। ফেনী নদী বাংলাদেশ আর ভারতের মাঝদিয়ে বয়ে গেছে। মঙ্গলবার হাট বসে। পূজা, নববর্ষে দুপার খুলে দেওয়া হয়। কিন্তু ওপারে পালিয়ে যেতে সুদীপ এখানে আসেনি।

তিনটার দিকে একটা বাস ছাড়ে এখান থেকে চট্টগ্রামের উদ্দেশে। তাই সে এই বাসস্টপে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু এখানে যে পরিচিত কারোর দেখা পাবে সেটা সে ঘুনাক্ষরেও ভাবেনি। পেছন থেকে একটা বিশ-বাইশ বছর বয়সী ছেলে সুদীপকে ডাক দিল, আরে সুদীপ দা না? কোথায় যাচ্ছেন? আপনি এখানে কেন?

সুদীপ যেন কিছু শুনতে পায়নি। আস্তে করে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করল। কিন্তু কীভাবে যে যাবে? প্রথমে এক পা দু পা করে রাস্তার পাশ দিয়ে ছুটে চলল। এরপর সে চোখ বন্ধ করে দৌড় দিল। মরুভূমিতে সাইমুম ঝড় উঠলে উটপাখিও বালুতে মাথা গুজে রেখে ভাবে কেউ বুঝি দেখেনি। সুদীপের অন্তত চোখ বুজে থাকার সুযোগ নেই, চোখ খোলা রেখে সন্তর্পণে দৌড়াচ্ছে। দৌড়াচ্ছে তো দৌড়াচ্ছে।
চেনা মানুষ দেখলেই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু ছেলেটা কে, তাকে ডাকল কেন? এই স্বেচ্ছা নির্বাসনে, বাড়ি থেকে দূরে তাকে কেউ চিনে ফেলতে পারে-এই আতঙ্ক তাকে আরো ভীত করে তুলল।
দৌড়ে কোথায় পালাবে? সামনে তো নদী। নদীর ওপারে ভারত। দিনের আলোয় তো সীমান্ত পাড়ি দেওয়া যাবে না। ছেলেটাও তার পিছু ছাড়ে না। দৌড়াতে দৌড়াতে ছুটে চলে এল।

সুদীপ হাঁপাচ্ছে। ছেলেটিকে দেখেই চিনতে পারল। দূর সম্পর্কের পাড়ার ভাই। কোনো ভনিতা না করেই, ছেলেটি বলতে শুরু করল, আপনি এভাবে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন কেন? আপনার ছেলে পিয়াসের নাম স্কুলের খাতা থেকে কেটে দিয়েছে সে খবর তো জানেন। কিন্তু এটা কি জানেন, আপনার মা ভীষণ অসুস্থ। পা ফুলে বিছানায় পড়ে আছে। আর আপনি পালিয়ে বেড়াচ্ছেন।
ছেলেটিকে দেখেই সুদীপ চিনতে পারল। পাড়ার ছেলে কিন্তু শহরে বড় হয়েছে। মাঝেমধ্যে গ্রামে যায়, সেও জেনে গেছে! বাহ! পৃথিবীতে বেঁচে থাকাটা আসলে ব্যক্তিগত না, অন্যের মর্জিমাফিক মানিয়ে চলা। মায়ের কথা মনে পড়তেই সুদীপের মনে একটু করে হয়তো অনুশোচনা হচ্ছে। তড়িঘড়ি করে জিজ্ঞেস করতে চাইল, কেমন আছে আমার মা? আমার আর দুই ভাইরা কি মায়ের একটুও যত্ন নিচ্ছে না? সুদীপ জানে না, বড় ছেলে হিসেবে তার এই পরিবারকে এই অবস্থায় ফেলে রেখে ছুটে চলা কতটা যৌক্তিক। তাও সামলে নিয়ে বলল, আমার মায়ের তো ও অসুখ আজীবনের। তা চমক, তুই এখানে কেন? আমি তো এখানে থাকি। তোর বৌদিকে ওর বাপের বাড়ি রেখে আসছি। ছেলেটাও ওখানে থাকছে।
চমক অত্যুৎসাহী হয়ে বলল, তা ওখানে ওরা চলবে কী করে? তুমি টাকা পয়সা কিছু পাঠাও ওখানে? বাড়িতে তো পাঠাও না, সবাই জানে। কী করছ তুমি জীবনে বল তো?

এতগুলো প্রশ্নের সবটুকু সুদীপের মাথায় প্রবেশ করেনি। শুধু শেষ প্রশ্নে সে আটকে গেছে, কী করছে আসলে সে?
মায়ের কথা ভাবলেই মনের দৃশ্যপটে সব অসহ্য চিত্রের অবতারণা হয় নির্মমভাবে। সেই ছোটবেলায় তার মা ছোলা, বাদাম ভাজত রাতভর। আর বিকালে কাগজের ঠোঙ্গা বানাত। তারা তিন ভাই, দুই বোন সেই ঠোঙ্গা বানাতে সাহায্য করত। মানুষের

বাসায় গিয়ে পুরানো খাতা, কাগজ, পেপার বোঝাই করে আনতে। ভর দুপুরে কারও বাড়িতে কড়া নাড়ায় অকথ্য ভাষায় গালি খাচ্ছে-সে খুব বেশি দিনের ঘটনা না। বাবাটা ভীষণ অকর্মণ্য। বাজারে গিয়ে টাকা পয়সা যা পেত, আসার সময় জুয়া খেলে তা উড়িয়ে আসত। রাতে মায়ের কাছে এসে-ভাত চাইত। যেদিন চাল থাকত না, মা-এর কিছু করার থাকত না। সেদিন মায়ের কপালে শনি। কি অত্যাচারটাই না করত। মায়ের হয়তো আশা ছিল, তার এই ছেলেগুলো বড় হবে, রোজগার করবে। তখন আর কেউ তাকে ভাত দিতে না পারলে মারবে না। সে পায়ের উপর পা তুলে বসে থাবে-খুব বেশি উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল হয়তো। সেই স্বপ্ন মায়ের বোধহয় আর পূরণ হবে না। অভুক্ত অবস্থায় বিছানায় পড়ে আছে। যমেও নেয় না।

সুদীপ নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে উত্তর দিল, জানি না। কি করছি। উপরওয়ালা যা করাচ্ছেন, তাই করছি।
চমকের বোধহয় এই উত্তর পছন্দ হয় না, একরাশ ঘৃণা নিয়ে সে সুদীপের দিকে থুতু ছুঁড়ে বলল, তোমার মতো ছেলের মরে যাওয়ার ভালো। শালা, নাটক করো।
চমক চলে গেল। সুদীপের আজকে আর টিটাগাং যাওয়া হলো না। পকেট থেকে একটা ফটোকপি করা কাগজ বের করল। তাতে লেখা রয়েছে-নাটকের পাণ্ডুলিপি। মানবপুত্র বৌদ্ধের নির্বাণ- নাটকের নাম।

সুদীপ বুদ্ধের চরিত্রে নিজেকে কল্পনা করে। যদি জিতেন দা কে বলে কয়ে রাজি করানো যায়, তাহলে হয়তো পরেরবার বুদ্ধের চরিত্রটা তাকে দেবে। বছরের পর বছর সাধু, শ্রমণ এসবের পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করে যাচ্ছে। তাও কারও সুদৃষ্টি তার উপর পড়ছে না। কিন্তু কুদৃষ্টি অভাবিতের মতো সবসময় তার পিছু নিয়েছে।

সেই কৈশোরেই শুরু। কবিতা আবৃত্তি করে বাড়ি ফিরছে। ফেরার পথে দলের সবার সাথে ম্যাচিং করা পাঞ্জাবিটা পাল্টে নিতে হবে। বাড়িতে এমনিতে ভাত জোটে না, তার আবার কাব্যচর্চা কীসে! আর বালামওয়ালার ছেলে-গান বাজনা করে বেড়াবে-অত স্বাধীনতা তাকে কেউ দেয় নি। আসার পথেই দেখে ফেলল, পাড়ার এক চাচা। গিয়ে বাবার কাছে নালিশ।

চমকের কথা সে কিছুতেই মাথা থেকে ফেলতে পারছে না। এদিকে নাটকের সংলাপগুলোও তার মনে থাকছে না। দুনিয়ায় এক নাটককেই সে জানপ্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছিল। অথচ সেই নাটককেই কিছুতেই বশে আনতে পারছে না। কিন্তু একবার যদি মঞ্চে উঠতে পারে, সুদীপের দৃঢ় বিশ্বাস কেউ তাকে আর পিছু টানতে পারবে না। শুধু এই নাটকের জন্যেই এই ঘর ছাড়া।

দুদিন পর সুদীপ জিতেন দা-র বাসার সামনে এসে দরজায় কড়া নাড়ল। জিতেন দা বের হলেন। উনার সাথে উনার নতুন স্ত্রীও আছেন। মেয়েটাকে সুদীপের চিনতে অসুবিধা হলো না। সুদীপের সাথেই এই দলে যোগ দিয়েছিল। জিতেন দাও এই রূপবতীর গুণে মুগ্ধ না হয়ে পারল না। প্রতিভার আতিশয্যে শয্যায় টেনে নিতেও তেমন বেগ পেতে হলো না-রূপসার। রূপসা আজকাল প্রায় সব নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করছে অনায়াসে। মেয়েটা অনেক দূর যাবে।

সুদীপ বলল, ভাই আমার রোলটা কি এখনো আছে? শহরে কোথাও থাকার জায়গা না থাকায় আমার রিহার্সালে আসতে সমস্যা হয়েছে।
জিতেন দা বলল, ঠিক আছে। ব্যাপার না। কিন্তু সংলাপ মুখস্থ করা আছে তো?
সুদীপ বলল, হ্যাঁ সব মুখস্থ করে রেখেছি।

জিতেন দা বলল, বেশ তাহলে। কিন্তু আমার বেশ তাড়া আছে আজকে। একটা ক্লাস নিতে যেতে হবে শহরের বাইরে। তুমি আমাদের বাসায় থেকো। রূপসা আছে, দেখিয়ে দেবে অভিনয়ের রোলটা। দেখেতো মনে হচ্ছে অনেক দিন ভালোমন্দ কিছু খাও না?
সুদীপ নিচু স্বরে বলল, আসলে জিতেন দা, পরিবারের অবস্থাটা ভালো না। আপনি তো জানেন সব। সবকিছু গুছিয়ে উঠতে সময় লাগছে।

জিতেন দা বলল, সুদীপ তোমার কিছু পাওনাদার আমার ঠিকানা খুঁজে পেয়েছে। আমার কাছে এসে তোমার খোঁজ করে। আমি তো ভাই জানি না, তুমি কোন বনে বাঁদাড়ে থাকো। নাটকের দলে এত ঝামেলা আমি নিতে পারব না। তাই নাটক করতে চাইলে, সব জঞ্জাল ফেলে এসো আগে। আচ্ছা আমি আসি। পরে কথা হবে।
এই বলে জিতেন দা চলে গেলেন। ড্রয়িং রুমে বসে অ্যাকোরিয়ামের দিকে তাকিয়ে আছে প্রদীপ। বিভিন্ন রঙের মাছ খেলা করছে। কত সুন্দর জীবন তাদের-কোনো দুঃশ্চিন্তা নেই। শিকারী নেই। খাবার দিয়ে যাচ্ছে চাকর। সপ্তাহান্তে পানি পরিবর্তন করে দিচ্ছে। সুদীপের যদি একটা এরকম জীবন থাকত।

বলতে না বলতেই, তার সামনে এসে হাজির হল রূপসা। আজকে তাকে ভীষণ সুন্দর লাগছে। একটা ব্যক্তিত্বসুলভ চেহারা ধরা দিয়েছে কয়দিনে। আসলে মানুষের পার্সোনালিটি, অভিব্যক্তি যা লোকে বলে-ক্লাস, সব কিছুই টাকা। প্রদীপ-এর এই বোধটা ফেলনা নয়।

রূপসা জানাল আগে খেতে হবে, তারপর নাটক নিয়ে বসবে। সুদীপ নিঃশব্দে রূপসাকে অনুসরণ করে ডাইনিং টেবিলে বসল। রূপসা শিমের বিচি দিয়ে কৈ মাছ রান্না করেছে । আর মোচার ঘন্ট। সুদীপ পেটপুরে খেল। খাওয়ার পর মনে হল, তার বাচ্চাটা কি খাচ্ছে? মামাটা তো কংস মামা।

রূপসা সুদীপকে হাত মোছার গামছাটা দিতে দিতে বলল, সুদীপ, তোমাকে জীতেন দা একটা কথা বলতে বলেছে।
সুদীপ ভেবে পেল না, কি এমন কথা যেটা কিছুক্ষণ আগে বলার সময় বলতে পারল না । এখন বলতে হচ্ছে।
সুদীপ রূপসার পিছু পিছু সামনের ঘরে এল। রূপসা বলতে লাগল, সুদীপ তুমি তো বেশ ভালো অভিনয় কর। কিন্তু তারপরও তোমার মধ্যে একটা জিনিসের অভাব আছে।

সুদীপ সজোরে চিৎকার করে উঠল, আমার মধ্যে কীসের অভাব আছে? কি করি নাই আমি এই অভিনয়ের জন্যে?
রূপসা বলল, শান্ত হও। শোনো এখানে যারা নাটক করে তারা সবাই শখের বশে করে।
সুদীপ প্রতিবাদ করে জানাল, আমিও কি শখের বশে করছি না? আমাকে কি একটা টাকাও দেওয়া হয়েছে এই পর্যন্ত।
রূপসা তাকে বারবার বোঝানোর চেষ্টা করল এভাবে পালিয়ে বেড়িয়ে নাটক হয় না। আর নাটক করে সুদীপের দারিদ্র্য ঘুচবে না। কিন্তু সুদীপ নাছোড়বান্দা। কিছুতেই, তার অংশটুকু অন্য কেউ করবে সেটা মেনে নিতে পারছে না। দ্রুত বেরিয়ে এল। ঠিক যেভাবে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। অ্যাকোরিয়ামের দেয়ালে বোকা মাছটা অনবরত ঠোকা দিচ্ছে, কাচের দেয়ালে বাইরের যেই জগত, সেই জগতে তার কোনো স্থান নেই সেটা বোকা মাছ বোঝে না। এর জন্যে কোনো প্রশ্ন বা যুক্তির দরকার নেই।

পরের শনিবার দিন জিতেন দার ড্রয়িং রুমে দশ পনেরো জন ছেলেমেয়ে নাটকের মহড়া করছে। জীতেন দা রূপসাকে বলল, শেষমেশ আপদটা বিদেয় হল। আজকে আসেনি। প্রত্যেকদিন এসে সেই ঘ্যানর ঘ্যানর। দাদা এই রোলটা আমাকে দাও, এইটা আমি বেশ পারব।
রূপসা কি যেন বলতে গিয়ে বলল না। মৌন সম্মতি জানাল জিতেন দা-কে।

নিচে কিসের যেন হৈ চৈ শোনা যাচ্ছে। দ্রুত এগিয়ে গেল জীতেন দা এবং অন্যান্যরা কি হচ্ছে দেখার জন্যে। একটা বিরাট জটলা। কাউকে কয়েকজন মিলে মারছে। রূপসা বলল, গিয়ে দেখে আসি তো। কী হচ্ছে নিচে?
জিতেন দা বলল, তুমি কোথাও যাবে না। আমি দেখে আসি।
জিতেন দা এবং দলের অন্যান্য ছেলেরা সবাই মিলে নিচে বের হল। জিতেন দা গিয়ে সবার উদ্দেশ্যে বলে উঠল, কি পেয়েছেন আপনারা? আমার বাড়ির সামনে একজনকে খুন করছেন? দেখি কে?

সে আর অন্য কেউ ছিল না। সুদীপ-ই। কয়েকজন আগে থেকেই ওত পেতে ছিল-ওকে ধরবার জন্য, কি ভেবেছে? পার পেয়ে যাবে? বাড়ি থেকে পালিয়ে আসলেই সব সমস্যার সমাধান। একজন বলে উঠল-ওকে ভিটা ছাড়া না, ওকে আমি পৃথিবী ছাড়া করব।
কিন্তু এতগুলো মানুষের সামনে ওরা আর কিছু করতে পারল না। রূপসা এগিয়ে এসে তাদেরকে শাসাতে লাগল, যদি এক্ষুণি এখান থেকে না যান, আমাদের এই দশ পনের জন আপনাদের মেরে কর্ণফুলীতে ভাসিয়ে দেব। মগের মুল্লুক পেয়েছেন। পুলিশের কাছে যান না, কেইস করেন।
সেদিনের মতো সব শান্ত হয়ে গেল। সবাই যে যার মতো বাড়ি চলে গেল। রিহার্সালও হলো না। সুদীপ তার আহত শরীর নিয়ে বারবার বৌদ্ধের চরিত্রের সংলাপ পড়ে যেতে লাগল। একা একাই অনুশীলন করছে। রূপসা ও জিতেন দা চোখ বুজে এই পাগলামি সহ্য করে যাচ্ছে।

পরের সোমবার থিয়েটারে। সবাই যে যার মতো প্রপস, মেকআপ রেডি করে নিল। এই দলের সবাই সুদীপের শূন্যতা অনুভব করছে কিন্তু কেউ কাউকে কিছু বলছে না। গ্রিনরুমে সবাই একে অন্যের দিকে চেয়ে আছে। একজনকে তারা খুব প্রত্যাশা করছে। মঞ্চে আলো তখনো জ্বলে নি। হালকা নীলাভ আলোতে দর্শক সারি ভরে যেতে লাগল।

মঞ্চের পর্দা উঠল। কক্রের তৈরি বোধি বৃক্ষের নিচে সবার জন্যে এমন অবাক করা জিনিস অপেক্ষা করছিল, স্বয়ং নির্দেশক জীতেনদার চক্ষু চড়ক গাছ। এ কোন বৌদ্ধ! কোথায় সে হলুদাভ বস্ত্র, পেছনে নক্ষত্রের আলো শোভিত স্বর্ণোজ্জ্বল বৌদ্ধ। থ্রিনরুমে সবার মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল।

দর্শকরা না চিনলেও নাট্য দলের লোকজন তাকে চিনে নিয়েছে। সুদীপ-পাঞ্জাবি পরে বসে আছে বোধি বৃক্ষের নিচে।
দর্শক সারিতে হাসির রোল পড়ে গেছে। কিন্তু সবাইকে স্তব্ধ করে এই একই পোশাকে সংলাপ শুরু করে দিল সুদীপ। কোনো দিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। সহ অভিনেতা-অভিনেত্রীর আজকে কোনো প্রয়োজন নেই। সে একাই একশ-আজকে তার একক অভিনয়।
তার দরাজ কণ্ঠে মানুষের হল ছেড়ে যাবার বাসনা যেমন পদদলিত হল, তেমনি তার একেকটি সংলাপ ধিক্কার জানাচ্ছিল সেইসব মানুষদেরকে যারা অবিশ্বাস করেছিল তাকে। একে একে মানুষ মোহগ্রস্ত হতে শুরু করে।
সুদীপ চিৎকার করে নির্বাণের পথ জানিয়ে দেয় সমবেত মানুষের কাছে। দুঃখের উৎস ভেতরে নয়, দুঃখের উৎস আরোপিত। সেইসব মানুষদের বিষবাক্য সে ফিরিয়ে দেবার পথও শিখিয়ে দেয়। তবে সেটা আরোও ঘৃণিত।
সবাই ভাবছে সে অভিনয় করছে। কিন্তু অভিনয়কে ভালোবাসতে গিয়ে কবে যে সে নিজেই অভিনয়ের জীবনে চলে গেছে-কোনো মানুষের সেটার বোঝবার সাধ্য ছিল না।
বিষের পেয়ালা হাতে নিয়ে সে সবাইকে দেখিয়ে দিচ্ছিলো। কিভাবে সব কিছু থেকে মুক্তি পেতে হয়। যেখানে যন্ত্রণা আর সুখের অনুভূতির সমীকরণ শূন্য।

আস্তে আস্তে তার দেহ নুয়ে পড়ল মাটিতে। মানুষের করতালিতে মঞ্চ মুখরিত। সবাই ধীরে ধীরে থিয়েটার ছেড়ে চলে গেল। আলো নিভে গেল মঞ্চে। পর্দা পড়ল সামনে।
কিন্তু পর্দার পেছনে রূপসা, জীতেন দা, দলের অন্যান্যরা যখন ছুটে গেল সুদীপকে প্রশংসা করতে, সুদীপ তখন নিদ্রামগ্ন। গভীর ঘুমে অচল তার নীল শরীর। মুখের কোণে বিজয়ের হাসি-
সেই বিজয় কার বিরুদ্ধে? নিজের? জন্মের? না অদৃষ্টের?

মৃত্যুপুরীর আঁধার

ফারমিন চৌধুরী তাজিম
আইন বিভাগ, ব্যাচ-৭

হ্যারিকেনের আলোটা বাড়িয়ে সন্ধ্যের অষ্টম ধাপের চায়ের কাপে চুমুক দিলাম। নাহ! কাজ হচ্ছে না। আজ বোধহয় আর লেখা সম্ভব নয়। বায়ু পরিবর্তনের অজুহাত দেখিয়ে যে উদ্দেশ্যে এই শ্যামপুর নামক গাও গেরামে এলাম সেটা এখনো ফল পায়নি। ধুঃ ছাই!! এভাবে তো আর সম্ভব না। এর চেয়ে তামাকে মনোযোগ দিলাম আমি। হুট করেই একটা বিরাট ভয়ানক শব্দ শুনতে পেলাম! পিলে চমকে যাবার মত অবস্থা। দ্রুত জানালার কপাট আলগা করতেই দেখলাম দাউ দাউ করে জ্বলছে দূরের গ্রাম। কিছু ছুটন্ত মানুষ আর কতগুলো গরু ছাগল দৌড়োচ্ছে ধোঁয়ার ভিতরে! দূর থেকে এটুকুই বোঝা গেল। হাল্কা হাল্কা সদ্য জ্বলে ওঠা চাঁদের আলোয় দুটো জিপ দেখতে পেলাম। আর রক্ষে হলোনা! এ গায়েও চলে এসেছে শালারা! ধ্যাৎ!! আবার ব্যাগপত্র গুছিয়ে যাই বেরিয়ে নতুন গল্পানুসন্ধানে। একবারে কলিকাতাতেই যাব ভাবছি! এখানে আর রোম্যান্টিকতা আসবে না চাঁদের আলোয়, বরং আসবে দুটো জিপ ভর্তি কালো ধোঁয়া, ধোঁয়াটে আর্তনাদ, আর্তনাদরত শিশু, শিশুর মৃত্যু দেখা মা, মায়ের খুন দেখা জোয়ান টগবগে যুবক, যুবকের হাতে অস্ত্র দেখা বৃদ্ধ রহিম মিয়া, মিয়াবাড়ির বৌয়ের ইজ্জত চলে যাওয়া, যাওয়া আসার ভীড়ে আমার হারিয়ে যাওয়া।

হারাতে হারাতেও এসে ভীড়লাম শিকদার বাবুর আবাসে। শিকদার সাহেব বড্ড ভদ্র মানুষ বটে। তার বাড়ির পাশেই ছিল এক সুন্দর শান্ত নদী।

এ নদীটায় একসময় বক আসতো, বসতো, মাছ খেতো, চলে যেতো, আবার আসতো। এ নদীটায় একসময় মাছরাঙা পাখিও আসতো ছোট মাছের টানে। ছোট ছোট ছেলেমেয়ের ঝাপিয়ে পড়ার আওয়াজে উড়ে যেতো সেসব পাখি। ভেঙে রহিমা বুড়ির মধ্যাহ্নকালীন কাঁচা ঘুমও।

এ নদীটায় রসূলপুরের শ্যামবাবুর ছেলেও আসতো দল বেঁধে, জাল ছড়িয়ে মাছ ধরতে। মাছ ধরার ফাঁকে হিরণময় বাবুর মেয়ে সুচরিতার সাথে চোখাচোখির প্রেমানুভব সৃষ্টি করতো। তারপর এক হাড়ি ভর্তি মাছ আর ছেড়া জাল বুনতে বুনতে তারা বাড়ি ফিরতো। অরুণ চাষার মেয়ে শ্রী তার সখীদের সাথে স্নানের উদ্দেশ্যে আসতো এ নদীর পারে। মোল্লা সাহেব আসতো জুম্মনকে নিয়ে ওযু করতে। একদিন জুম্মনের মনে হুট করেই হাল্কা চিন্তাজড়ানো আশংকা ভর করেছিল ওযুর ফাঁকে। চিন্তাজড়িত উদ্বিগ্ন মুখে সে জানানও দিচ্ছিল মোল্লা সাহেবকে সেই আশংকার কথা।

কে জানতো সেই আশংকাই পরদিন সকালে সত্য রূপে আবির্ভূত হবে!

এখন আর এ নদীতে এসব কিছুই হয়না! সেবার যখন এ গ্রাম ছাড়ছিলাম তখন লাল নদী দেখেছিলাম, দেখেছিলাম বক-মাছরাঙার বদলে কিছু শকুন আর কাককে! নৌকোয় এগোতে এগোতে দেখেছিলাম একটি ছেঁড়া শাড়ী! আরে এটা শ্রী দিদির না? রক্তমাখানো মোল্লা সাহেবের মাথার টুপিও চোখে পড়েছিল! বাজারের ধারে শ্যামবাবুর দোকানের উপরের কালো ধোয়া নিভু নিভু আগুনের জানান দিচ্ছিল। অথচ কেউ দোকানের ভিতর জড়াজড়ি করে পড়ে থাকা বাপ-ছেলের লাশ খেয়ালই করেনি। করবে কী করে? সবাই তো তখন উজানপুরের আশার আলোর পানে চেয়ে রয়েছে জীবিত চোখে। কিন্তু কে জানতো

উজানপুর পৌঁছতেও ব্যর্থ হবে কিছু নৌকো। সেসব ব্যর্থ নৌকোর একটিতে শামসুদ্দিন আহমেদ ছিলেন, তরুণ লেখক, লেখালেখির খাতিরে তার সাথে বহুবার দেখা হয়েছিল। কথায় কথায় বলতেন দেশমাতৃকার কথা। '৭১ এর এপ্রিলে তার সাথে শেষ দেখা। আর দেখা হয়নি। সুযোগটাও মেলেনি। আজ এই সাত বছর হতে চলল, তার মৃত্যুদিবসের। তার ছোট ভাই কলিমুদ্দিন একটি কাব্যগ্রন্থ বের করেছে তাকে উৎসর্গ করে, সেটাই পড়ছিলাম আর পুরোনো দিনে হারাচ্ছিলাম। উনি লিখেছেন :

চেনো আমায়?

সাত কোটি সন্তার এ ধরণী,
আমি তাহাকে মানিয়াছি জননী।
তাহারই স্বার্থে বানাইয়াছি ধর্ম,
আফসোস! উহা নাকি আজ একধরণের উচ্চ বর্ম!
জননীর স্বার্থেই আমিই বেচিয়াছি তাজা প্রাণ,
অথচ বন্যায় মোর পরিবার পায়নি একছটাক ত্রাণ!
আমি কাঁদিয়াছি গগণবিদারী চিৎকারে,
যখন পাকিস্তানি ঝড়ো হাওয়া আসিয়াছিল মোর ঘরে!
চোখের সামনে ওরা ছিঁড়েছিল মোর বোনের বস্ত্র,
আমি কাঁদিতে কাঁদিতে ধরিয়াছি অস্ত্র!
আমি চুপ থাকিনি, ভয়ও পাইনি
তাই "এদেশ যাক চুলোয়", সেই বাক্যটাকেও বলিনি।
আমি দুর্বার, আমি প্রাণবন্ত, আমি চঞ্চল, আমি ভয়ংকর;
আমি ভগবানের বিরুদ্ধে লড়তে যাওয়া এক ষোড়শীয় অহংকার!
আমি ছিলাম, হয়তো আছি, কিন্তু থাকবোনা আগামীতে;
কারণ দেশপ্রেমহীন এদেশের বাঙালিয়ানা পাশ্চাত্যে যে মেতেছে!
আমি যাই ধানক্ষেত মাড়িয়ে, গ্রাম ছাড়িয়ে, বর্ডার পেরিয়ে;
এদেশ মোরে করেছে বিতাড়িত, তাই যাচ্ছি কালের গহ্বরে হারিয়ে!
আসব, একদিন আবারো আসব, নতুন তালে, নতুন আঙ্গিকে;
যেদিন সূর্য উঠবে উজানতলী গায়ের উত্তর বুকে!

নিরাপত্তার মাঝে অনিরাপত্তা

আজমীর হোসেন
ইংরেজি বিভাগ, ব্যাচ-৩

অলসতাকে করে নিয়ে জীবন সঙ্গী
ভেবে নিলাম নিজেকে সুখী,
আরামে - আয়েশে কাটিয়ে জীবন
কে বলে আমি দুঃখী?
কাজ - কাম করে, দুনিয়া উল্টে
পায়না লোকে সুখ,
শুয়ে, বসে থেকে আমিতো ভালোই
পাইনা স্পর্শের দুখ।
অর্জনে - বিসর্জনে মিলিয়ে জীবন
তাইতো জেনে এসেছি,
যাচাই - বাছাই না করে সবে
স্রোতের জলে ভেসেছি।
কখনও কিছু না করাতে
কখনও হয়নি সমালোচিত,
কপালে যা রেখেছিল খোদা
তা নিয়েই ছিলাম প্রীত।
চেষ্টা করতে দেখে লোককে
করেছি উপহাস,
এভাবে করে উপর্যুপরি নিজের
করেছি সর্বনাশ।
পরিশ্রম করতে করতে লোকে
অর্জন করলো মস্ত ,
অর্জন না থাকলেও বিসর্জন নাই মোর
একথা খাঁটি সত্য।
এসব করে হঠাৎ একটু
পিছনে ফিরে দেখি,
যা দেখি তা দেখে বুকে
ঘোলা হয় মোর আঁখি।
মহৎ কর্ম দিয়ে লোকে সবের
মনে করলো স্থান,
খেয়াল করে দেখি মোর স্মৃতিগুলো
হয়ে গেছে ম্রিয়মান।

আব্দুল্লাহ আর রাকিব
ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ (১ম বর্ষ)

তনয়

শুনেছি, আজকাল তনয়েরা মাটি-জলের গন্ধ মাখেনা
চাঁদের রূপে মজে সময় ভোলে না
বৃষ্টিবিলাসে জ্বর বাধায় না
উদাস মনে জলরাশির ঢেউ গোনে না
বোধহয়, ভালবাসারা পয়সায় বিকি-কিনি হয় বলে।

শুনেছি, আজকাল তনয়েরা উদভ্রান্তের মতো ঘোরে
এখন আর টোল পড়ে না মৃদু হাস্যে
হঠাৎই স্ফুরণ ঘটে না চঞ্চলতায় ভরা কথা মালো
দর্পণে তাকিয়ে হাত চলে না চুলের কারুকাজে
বোধহয়, ভালবাসারা বাস্তবতার দোহাই দেয় বলে।

শুনেছি, আজকাল তনয়েরা অনেক পেশাদার
সম্পর্কে লাভ-ক্ষতির হিসাব কষে
কথায় কেমন যেন লাগাম দিয়ে থাকে
খেয়ালী মন নিয়মসিন্ধে আটকে থাকে
বোধহয়, ভালবাসারা শর্ত জুড়ে দিয়েছে বলে।

শুনেছি, আজকাল তনয়েরা বর্ণচোরা
চরিত্র বদলে ভারী পাকা-পোক্ত
নিজের সত্তারে বিলীন আর দমাতেই ব্যস্ত
জন্ম-পরিচয় নামক শেকলেই আবদ্ধ
বোধহয়, ভালবাসারা প্রস্ফুটিত হবে না বলে।

শুনেছি, আজকাল তনয়রা নান্দনিকতার হাহাকার দেখায় না
বোধহয়, আঁকা ছবিতে শেষ আঁচড় দিতে পারবে না বলে...

ইহা তনয়ের দিনপঞ্জিকার ছেড়া পাতাগুলি
জোড়াতালি দিয়ে পাওয়া নিছক প্রলাপ!

জোবায়ের হোসেন
ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ, ব্যাচ-১৮

প্রশ্নপত্র

যদি একরাশ শিউলি এনে হাতে দেই?
ফেলে দেবে নাকি আদর করে পকেটে ভরে নেবে?
যদি ঘাস দিয়ে বেঁধে একটা পায়েল পরিয়ে দেই?
ছিঁড়ে ফেলবে নাকি সারারাত ওটা নিয়েই গল্প করবে?
যদি সস্তা দোকানের নোংরা কাপে চায়ের আমন্ত্রণ জানাই?
দুর্গন্ধে নাক চেপে চলে যাবে নাকি বরাবরের মতই চায়ে চিনি কম দিতে বলবে?
যদি গভীর রাতে ফোন দিয়ে আবোল তাবোল বকতে থাকি?
ফোন রেখে ঘুমিয়ে পরবে নাকি আমার অবস্থা দেখে ডাইনির মত হাসি দেবে?
'মিথ্যে বলে কি হবে বলো, তোমার হাসি বিদঘুটে' বললে?
'আচ্ছা' বলে অভিমান করবে নাকি অকথ্য কিছু গালি শোনাবে?
বসন্তের বিকেলে ঘুরতে গিয়ে তোমার বাবার সামনে পড়ে গেলে?
মাথা নিচু করে তাঁর পাশে চলে যাবে নাকি শক্ত করে আমার হাত ধরে দাঁড়িয়ে থাকবে?
স্বপ্নীকৃত কিছু মিথ্যে স্বপ্ন দেখালে?
বাস্তবের অবাস্তব শিক্ষা দেবে নাকি আমার স্বপ্নে কোনো দেবীর রূপ চাইবে? একাত্মতার বর দেবে?
যদি মৃত্যুমুখে হাতটি ধরে থাকতে বলি?
ভিজে চোখে উঠে চলে যাবে নাকি হাসিমুখে কপালে চুমু খেয়ে
দু হাত চেপে ধরবে?
যদি বলি জগতের সমূহ ভালোবাসা তোমায় এনে দেবো?
নেবে? নাকি সংকোচে ফিরিয়ে দেবে?
আমায় ভালোবাসো কি না জানতে চাইলে?
আজ কি তবে উত্তর দেবে নাকি আজও কোনো বেওয়ারিশ লাশ হয়েই আমার ঘুম ভাঙবে?

শীতের সকাল

মেহেদী হাসান
শাখা কর্মকর্তা, রেজিস্ট্রার অফিস

শীতের সকাল সায়াহ্ন আঁধারে ঢাকা
মাকে ডেকে বললাম রবি কখন পড়েছে ঢাকা
হেলাল উঠেছে কখন
তোর দেখি ব্যক্কেলের লক্ষণ
সকাল হল মোটে
কই! কল কাকলির ডাকত আজ নাহি জোটে
আজিকে নাহি দেখি দিগ্বলয়
ঠান্ডায় কুয়াশায় দিনকে ডেকে লয়
মোরি মনে হয় শর্বরীর ঘন সিয়া দিনকে ডেকে লয়।

ভুলচুক নাহি কর
নাহি গাস মর্সিয়া
ঐ দেখ উর্নাজাল বন্ধ করেছে
কুহুলি ডাক বিহঙ্গ মনে হয় মরেছে
দেখ তরুছায়া মসীমাখা
ক্ষুর ধারা ঘেয়ো থরে বিথরে ঝরে।

ঐ দেখ বন্ধন তোর নব বেশ বর্ণে পরে
মনে হয় দেখ আজিকে সব হত
করিতেছে স্বর্গ বিত্ত।

উঠ, বেলা ক্ষীয়মাণ
কর্মে যাও হে নও জোয়ান
অপেক্ষা করো মোর জননী
দেখি আজ আতপকে দেখিনি
এ যে দেখি লক্ষণ অলক্ষণীয়।

দেখ মা জলধির পানি বেয়ে
কুয়াশা যেন আকাশ ছুঁয়ে
অহি কুক্কুর দেখ ছায়ানটে
শিয়াকুল কুক্কুরপুঞ্চ আছে বর্ম
আমিকে নাহি যাব ভ্রম কর্ম
যাও তুমি বানাও পিঠে।

মোছাঃ শরীফা ইয়াসমিন
শিক্ষক, বিইউপি স্নেহনীড়, ডে-কেয়ার সেন্টার

প্রিয় বাংলাদেশ

রাতের শেষে দিন যে আসে
পূর্বে সোনার রবি ভাসে
বলতে পারো কোথায়?
সবুজ ধানের ক্ষেতটি ঘেষে
হিমেল হাওয়ায় আওলা কেঁশে
গ্রাম্য মেয়ে যাচ্ছে হেসে
বলতে পারো কোথায়?
সবুজ শ্যামল সোনার গাঁয়ে
রাখালিয়া উদাম হয়ে
কাজল গরু গোসল দিয়ে
বৃক্ষ তলে বংশী নিয়ে
সুর মিলিয়ে যায়।
বলতে পারো কোথায়?
ভর দুপুরে দিঘীর জলে
পাড়ার সকল দস্যি ছেলে
ভাসায় জলে ভেলা,
শাপলা লতায় জড়িয়ে চরণ
জলে করে খেলা।
বলতে পারো কোথায়?
মায়ের আদর সোহাগ পেলে
শিশুর দুঃখ যায় যে ভুলে,
উঠান ভরা ধান নিয়ে
সে দুর্বা ঘাসে মিশায়।
বলতে পারো কোথায়?
আকাশ ভরা বকের সারি
নদীর বাঁকে জমায় পাড়ি,
হিমেল হাওয়ায় কাশফুলে যে
দোলা দিয়ে যায়।
বলতে পারো কোথায়?
হাজার ফুলের সুবাস ভরা
সাজানো যেই বসুন্ধরা,
রূপের রঙ্গে রঙ্গিন করা
আর শ্যামল পরিবেশ।
সে যে আমার জন্মভূমি
প্রিয় বাংলাদেশ ॥

প্রভাষক তাহমিনা সুলতানা
বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ

প্রশ্ন

দিচ্ছ পাড়ি বহু দূর
স্বর্গ মর্ত্য, পাতালপুর
ভেঙ্গেছ বাঁধা অনায়াসে
হওনি নত কারো কাছে,
সাফল্য দিল ধরা ভালবেসে।
জানতে বড় ইচ্ছে করে
বন্ধু তুমি কেমন করে-
ডিঙ্গাচ্ছ পথ রাত-দুপুরে?
আমি কেন পারিনা যে
তোমার মত সফল হতে!
লোহার শিকল, লোহার খাঁচা ভাঙ্গব
আমি কেমন করে?
বন্ধু মোর বলল্ হেসে
কাজ করো ভালোবেসে,
আমি যখন দিচ্ছি পাড়ি
হিমালয় কাঞ্চনগিরি,
তুমি তখন মরছ বসে
না পাবার হিসেব কষে।
হতাশা ছেড়ে যাও ছুটে
তোমার আপন লক্ষ্যপানে,
সাফল্য তখন তোমার পানে
ধরা দিবে এসে আপনে।

আল জামাল মোস্তফা সিদ্দাইকী (তমাল)
সহকারী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ

মুহূর্তের খোয়াবে

অন্তহীন রোদে অনিশ্চিত পথে গুনছি জীবনের প্রহর
রঙের তরঙ্গে ভেসে চলেছি নতুন পাল তুলে
মনের পদ্মে মুহূর্তের খোয়াবে হারাতে আর পারিনা
অন্তহীন পথ পায়না সীমানা নুনের দ্বীপ পেরিয়ে
শীতের ছোয়ায় রূপবতী রাত কেঁদে মরে একাকী নির্জনে
অন্ধকারে ডুবে আমাকে দেখায় শব্দময় সাগর সৈকত।

ভালোবাসায় উপত্যাকায় আর্তনাদ করি স্বার্থপর হয়ে আমি
জীবনের প্রেরণায় সবকিছু এলোমেলো আশার তরী ডুবে
উষ্ণতা আসবে দীর্ঘতর সময়ে জীবন জাগার গানে
ফাগুনের চুম্বনে ধূসরতায় ঢাকে আমার উজ্জ্বল মুখ
সময়ের প্রান্তে ফলহীন বীক্ষে ফুল ফোটেনা এখন
শূন্যতার সবুজে আকাঙ্ক্ষার বিকারে নির্বাক আকাশের তারকা।

মুহূর্তের ভালোলাগায় ধাবমান নেই কালের পথ ধরে
উদার আকাশে স্বপ্নের নেশায় কেউ বসে থাকে না
নির্জন মধুমতিতে বাতাসের হাহাকার আমাকে ব্যাকুল করে
ব্যর্থতার নিঃশ্বাসে তন্ময় কথা বলতে পারিনা গোপনে
জোসনার ভারে উজ্জ্বল আলোতে হারাতে পারিনা আর
রাতের নিবিড়তায় অবিশ্বাসে ভরা জীবনের ঘাটে ঘাটে।

মনের মাঠে আশার বীজ বপন হয় না বহুকাল
ছায়ার অন্তরে কথা কয় পথহারা এক পথিক
অন্তর্লীন যন্ত্রণায় কেঁদে মরি প্রতীক্ষার চরম উচ্ছ্বাসে
অনেক দূরত্বে পড়ে আছি চাবির গোছার মতো
অনন্ত পিপাসায় মনের আহবানে সাড়া নেই নির্জনতায়
ভালোবাসার প্রত্যাশায় হারাতে পারিনা অচেল রাতের ঘ্রাণে।

মুহাম্মদ কাউছার মাহমুদ
শাখা কর্মকর্তা

মা

তোমাতে শুরু মোর
তোমাতেই শেষ,
তোমাতে মোর দুঃখ-সুখ
তোমাতেই আছি বেশ।
তুমি মাগো থাকলে দূরে
লাগে বড় একা,
তুমি বিনে চোখ থাকিলেও
হয় না কিছুই দেখা,
রঙিন এই ধরা মোর লাগে সাদা-কালো,
তোমার মতো কেউতো কভু
বাসে না আমায় ভালো।
স্বার্থপর এই পৃথিবীতে
সবাই ব্যস্ত নিজের খোঁজে
হাত বাড়ালেও কেউ কখনো
দেয় না যে আর দেখা।
তুমি আজও স্বার্থ ভুলে
নিচ্ছ আমায় বুকে তুলে
জরাজীর্ণ শরীর নিয়ে
কষ্ট করছো একা,
কভু তুমি চলে গেলে
কী করে তোমায় থাকব ভুলে,
রঙিন স্বপ্ন হবে ফিকে
হ'ব বড় একা।

হিমালয় মুগ্ধতা

প্রভাষক ফৌজিয়া আহমেদ
ডিপার্টমেন্ট অব এনভায়রনমেন্টাল সাইন্স

ছোটবেলা থেকেই স্বপ্নগুলো ছিল আকাশছোয়া। মাঝে মাঝে ভাবতাম এ স্বপ্নগুলো হয়তোবা অসম্ভব, অবাস্তব আর কল্পনাতীত। কিন্তু হিমালয়ের কাছে যাওয়ার স্বপ্নটিকে মনের কোণে জিইয়ে রেখেছিলাম সবসময়। প্রথমবার যখন নেপালে গিয়েছিলাম, দূর থেকে দেখা বরফাবৃত সাদা পাহাড় হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকছিল। তখনই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলাম যে এর কাছে যেতেই হবে। ভাবতেই পারিনি মাত্র এক বছরের মধ্যেই আমি এমন একটি দুর্লভ স্বপ্ন পূরণের সুযোগ পেয়ে যাব। সুযোগটি এলো বাংলা মাউন্টেনিয়ারিং অ্যান্ড ট্রেকিং ক্লাব (বিএমটিসি) এর হাত ধরে।

২০১৪ সালে বিএমটিসি এর সদস্য হই। দুবারের এভারেস্টজয়ী এম এ মুহিত ভাইসহ আরো অনেক অভিজ্ঞ পর্বতারোহীর সাথে পরিচয় ও তাদের অভিজ্ঞতা জানার সুযোগ ঘটে। সেই সাথে হিমালয়ের কাছে যাওয়ার স্বপ্নটিও দানা বাঁধতে থাকে। হঠাৎ মাউন্ট কিয়াজো-রি অভিযানের সদস্য হওয়ার ডাক পেলাম, এ যেন ছিল আমার কাছে মেঘ না চাইতেই বৃষ্টির মতো। এরকম অভিজ্ঞ একটা দলের সদস্য হতে পেরে মনে হচ্ছিল আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছি। অবশেষে সেই দিনটি এলো, ২৭শে ডিসেম্বর ২০১৫। আমাদের যাত্রা শুরু হল। দুপুরে ১.৫০ এ আমরা নেপালের ত্রিভুবন ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে পৌছলাম, সেখানে আমাদের জন্য অপেক্ষমাণ ছিলেন নেপালী ভ্রমণসঙ্গীগণ। তাদের কাছ থেকে পেলাম উষ্ণ অভ্যর্থনা। এরপরের দুটো দিন খুব ব্যস্ততায় কেটে গেল কেনাকাটা করে, নতুনদের জন্য ব্যাগ, জুতো, জ্যাকেট থেকে শুরু করে সামিটের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনা হলো।

আমাদের অভিযানের দিনটিও চলে এল, ৩০শে অক্টোবর। সারারাত ধরে ভেবেছি, একবার রোমাঞ্চিত হয়েছি, আরেকবার ভয়ে কুঁকড়ে গিয়েছি, কি যে হবে পরদিন থেকে তাই ভেবে ভেবে। শেষমেশ নিজের মধ্যে একরুক আত্মবিশ্বাস নিয়ে ঘুমোতে গেলাম যে, আমি পারবই। খুব সকালে যার যার ব্যাকপ্যাক নিয়ে আমরা চলে যাই ত্রিভুবন ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে, ডোমেস্টিক ফ্লাইটে উড়াল দেব লুকলা। লুকলা এয়ারপোর্টের নাম তেনজিং-হিলারি এয়ারপোর্ট, যা বিশ্বের ঝুঁকিপূর্ণ এয়ারপোর্টগুলোর মধ্যে একটি। প্লেন থেকে নামতেই হঠাৎ একটা দমকা বাতাস খেলে গেল, কারণ আমরা চলে এসেছি ৯৩০০ ফুট উচ্চতায়। সরাসরি এত উচ্চতায় চলে আসায় প্রচণ্ড ঠান্ডা লাগতে থাকে, অক্সিজেনের অভাবও কিছুটা টের পেতে থাকি। তবে কিছুক্ষণ পরেই আবহাওয়াটা মানিয়ে নিতে পারি, স্বাভাবিক হয়ে যায়। ট্রেকিং শুরু করার আগে মুহিত ভাইয়ের নির্দেশ, প্রচুর পরিমাণে গরম পানি, চা, কফি, স্যুপ খেতে হবে, তাহলে বমিভাব বা মাথাব্যথা এই সমস্যাগুলো আর হবে না।

প্রথমবারের মত ট্রেকিং শুরু হল, আজকের গন্তব্য মানজো গ্রাম। প্রথম অংশটুকু বেশ ভালোই ছিল, শুধুই উৎরাই। এরপর শুরু হল চড়াই-উতরাই দুটোই। অসাধারণ পথ, ঝুলন্ত সেতু, ঝরণা, নীল পানির জলস্রোত পেরিয়ে হেঁটে চলেছি আমরা। ক্ষণে ক্ষণে টিংটিং ঘন্টার শব্দ আরো যেন রোমাঞ্চ ছড়িয়ে দিচ্ছিলো, ইয়াকের গলায় বাঁধা থাকে এই বিশেষ ঘন্টা। যা শুনে অভিযাত্রীরা ইয়াকের যাওয়ার জন্য পথ ছেড়ে দেয়। শেষের দিকে আর পা চলছিলইনা, সন্ধ্যা নামার সাথে সাথে আমরা পৌছে গেলাম আমাদের গন্তব্যস্থলে। রাতটা একটা গেস্ট হাউসে কাটিয়ে খুব ভোরে আমরা রওনা হলাম নামচে বাজারের উদ্দেশ্যে। নামচে বাজারের উচ্চতা ১০,৩০০ ফুট, একে বলা হয় শেরপাদের রাজধানী। দুপুরের মধ্যেই আমরা নামচে বাজার পৌছে গেলাম, এ. বি. ফ্রেন্ডশিপ লজে উঠলাম। রুম দেখেই

মনটা ভালো হয়ে গেল, রুমের জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে সুবিশাল পর্বত খোয়াংদে, সাদা বরফাবৃত পর্বতটি সগৌরবে দাঁড়িয়ে যেন আমাদের স্বাগত জানাচ্ছে। শরীরকে এক্লেমেটাইজড বা খাপ খাওয়ানোর জন্য উচ্চতায় উঠে আবার নিচে ফিরে আসতে হয়। হাইট গেইনের জন্য পরদিন আমরা গেলাম হিলারির স্মৃতি বিজড়িত গ্রাম খুমজুং এ যার উচ্চতা ১২,৪০০ ফুট। পথে এভারেস্ট ভিউ হোটেলের সামনে খুব কাছ থেকে দেখতে পেলাম সাগরমাতাকে, সগৌরবে দাম্ভিকতার সাথে দাঁড়িয়ে আছে মাউন্ট এভারেস্ট। হিলারির গ্রামটি খুব সুন্দর সাজানো-গোছানো, সে গ্রামেই আমরা দুপুরের খাবার খেয়ে নিলাম। শেরপাদের জন্য হিলারির প্রতিষ্ঠা করা সুন্দর স্কুলটি দেখে খুব ভালো লাগল। বিকেলে আবার ফিরে এলাম নামচে বাজার। পরদিন সকালে নাস্তা করে রওনা দিলাম আরেকটি গ্রাম মেন্দের উদ্দেশ্যে, গ্রামটির উচ্চতা ১২,৬০০ ফুট। পথেই একটা লজে দুপুরের খাবার সেরে নিলাম। বিকেলের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম মেন্দে গ্রামে। ততক্ষণে কুয়াশায় চারদিক ঢেকে গিয়েছে। এই গ্রাম থেকেই শুরু হয় আমাদের তাঁবু জীবন। এখানেও এক্লেমেটাইজের জন্য দুদিন থাকব আমরা। মেন্দেতে দু'রাত কাটিয়ে আমরা রওনা দেব কাঙ্ক্ষিত বেসক্যাম্পের উদ্দেশে।

৪ঠা অক্টোবর ২০১৫। লক্ষ্য মাউন্ট কিয়াঙ্গো-রি বেসক্যাম্প। আগের দিন রাতে খুব ভয়ে ভয়ে ছিলাম। কারণ আজ পার হতে হবে অনেকটা চড়াই, আর রাস্তাটাও অনেক লম্বা, হাঁটতে হবে অনেক। সকালে নাস্তা সেরে সাথে নিয়ে নিলাম প্যাকেট লাঞ্চ। কারণ এ পথে আর কোন লজ নেই, আমাদের পৌঁছতে বিকেল হয়ে যাবে। সকাল ৮ টায় আমাদের যাত্রা শুরু হলো মেন্দের মনেস্ট্রিটা পার হয়ে শুধু উঠছি আর উঠছি, মনে হচ্ছিল এ চড়াই এর বুঝি কোন শেষ নেই। ঘন গাছের সারির মধ্য দিয়ে সরু রাস্তা, উঠতে উঠতে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। বনের রাস্তা শেষ হওয়ার সাথে সাথে পথটি আরো কঠিন হয়ে উঠল। একপাশে উঁচু পাহাড়, আরেকপাশে গভীর খাদ, মাঝখানে রাস্তাটি খুবই সরু। পথ চলতে হচ্ছিল খুবই সাবধানে। দুপুর একটায় পাহাড়ের ঢালে বসলাম দুপুরের খাবার খেতে। প্যাকেটে ছিল পুরি, সেদ্ধডিম, কমলা আর বিস্কিট। ট্রেকিং এর সময় সারাক্ষণ চকলেট খাওয়ার কারণে মুখে ঘা হয়ে গিয়েছিল আমার, তাই কোনো কিছুই খেতে পারছিলাম না। কিন্তু আরো অনেকটা পথ যেতে হবে, তাই কোনরকমে ডিম আর কমলাটা খেয়ে আবার রওনা হলাম। এবার পথ আরো কঠিন, বড় বড় বোল্ডার, পাথর ছড়ানো ছিটানো। কোন কোনটা আবার ছিল নড়বড়ে, তাই পা ফেলতে হচ্ছিল খুব সাবধানে। পাথরের পথ পার হতেই শুরু হল উৎরাই, নামছি আর নামছি। নামার পথে শেষে শুরু হল সমতল রাস্তা, ততক্ষণে আমার আর পা চলছে না। দুপুরে ঠিকমত না খেতে পারায় ক্ষুধায় শরীরের সব শক্তি শেষ হয়ে আসছিল। সমতল ধরে হাঁটতে হাঁটতে snow এর দেখা পেলাম, পাথরের ফাঁজে ফাঁজে বরফ। অবশেষে দূর থেকে বেসক্যাম্পের তাঁবু দেখতে পেয়ে আমি সেই খুশি, আমরা পৌঁছানোর আগেই তাঁবু টাঙিয়ে ফেলেছে আমাদের গাইড। বেসক্যাম্পে পৌঁছানোর পর সে কি আনন্দ, তা ভাষায় প্রকাশ করার নয়। যে লক্ষ্য নিয়ে অভিযানে এসেছিলাম তার সবটাই ভালোভাবে পূরণ করতে পেরেছি, তাই একদিকে যেমন আনন্দ-উত্তেজনা, অন্যদিকে স্বস্তি।

পাঁচটি রাত কাটিয়েছিলাম এই বেসক্যাম্পে। গভীর রাতে আকাশে দেখা অদ্ভুত তারার মেলা, রাতে বরফ পড়া আর সকালে ঠাস ঠাস শব্দে বরফ ভাঙা, দূর থেকে ভেসে আসা ইয়াকের ঘন্টার শব্দ এক মুগ্ধতা ছড়িয়ে দিয়েছিল। ভালোবেসে ফেলেছিলাম বেসক্যাম্পকে, ভালোবেসে ফেলেছিলাম প্রতিদিনের চ্যালেঞ্জকে। এ অভিযান আমায় চোখে আঙুল দিয়ে দেখালো কিভাবে সীমিত সম্পদ নিয়ে সুখী জীবন যাপন করছে পাহাড়ী মানুষ। নেই কোনো উচ্চাকাঙ্খা, নেই কপট আলোর ঝলকানি, তারপরেও হাসিমুখে বিরূপ আবহাওয়ায় দিন যাপন করে চলেছেন। প্রতিটি মানুষই ব্যক্তিগত জীবনে এমন হিমালয় সমান চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়, এই অভিযান আমায় শেখালো কীভাবে তার মোকাবিলা করতে হয়। ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমে মানুষ জয় করতে পারে সবকিছু।

হিমালয় তার প্রতিটি পরতে পরতে সৌন্দর্যের পসরা সাজিয়ে রেখেছে। নিজ চোখে না দেখলে এ সৌন্দর্য কল্পনা করা যায় না। হিমালয়ে আমার প্রথম অভিযানটি তাই হিমালয় সমান মুগ্ধতা ছড়িয়ে দিয়েছিল, ভরিয়ে দিয়েছিল আত্মবিশ্বাসে।

লিলি ফুলের দ্বীপে

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, পিএইচডি
সহকারী অধ্যাপক, ডিজেস্টার অ্যান্ড হিউম্যান সিকিউরিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগ

(লেখক জাপান সরকারের মনবুকাগাকুশ বৃত্তি নিয়ে জাপানে স্নাতকোত্তর এবং পিএইচডি সম্পন্ন করেন। লেখাটি জাপানের ওকিনাওয়া প্রিফেকচার এর ইয়ে দ্বীপে ভ্রমণ নিয়ে। লেখার ভাবগাম্ভীর্য ভ্রমণকালিন আবেগের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রকাশ করার ক্ষুদ্র প্রয়াস ঘটানো হয়েছে)

আমরা যখন পৌছলাম কটকটা রৌদ্দুর ছিল, ছোট্ট একখানা দ্বীপ, অতীব সুন্দর গাঢ় নীল সাগর চারদিকে, আহ! সাগর এত নীল হয় কীভাবে! উজ্জ্বল নীল আকাশ। মনে হতে লাগল, আকাশ সাগরে ঝাঁপ দিয়ে নীল করে দিয়েছে চারদিকে সাগর ছোট্ট জাহাজ থেকে এই দ্বীপটাকে এতই পিচ্চি লাগছিল, মনে হচ্ছিল এতটুকুন এক দ্বীপে মানুষ থাকে! জিজ্ঞাসা করলাম, হাজার খানেক লোক হয়ত থাকে দ্বীপখানায়, এরা বিভিন্ন চাষবাস করে- এর মধ্যে লিলি ফুল অন্যতম। প্রতি বছর মে মাসের প্রথম সপ্তাহে লিলি ফুল নিয়ে উৎসবের আয়োজন করে এরা। আমাদের উদ্দেশ্যও তাই, লিলি উৎসব দেখতে যাওয়া, সাথে এক অজানা দ্বীপ ঘুরতে যাওয়া।

ওকিনাওয়ার উত্তর দিকে অবস্থিত ইয়ে নামক ছোট্ট এক দ্বীপ, জাপান হচ্ছে দ্বীপের দেশ। আর ওকিনাওয়া হচ্ছে ছড়িয়ে থাকা দ্বীপ নিয়ে এক প্রিফেকচার। অসংখ্য দ্বীপ চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে মাঝে মাঝে কোনো কোনো পাহাড়ের চূড়ায় হাঁটতে গেলে দূরে দেখা যায় কোনো এক দ্বীপ, হঠাৎ করে বিষন্ন হয়ে যেতে হয়, হাজার খানেক প্রশ্ন চলে আসে ঐ দ্বীপে মানুষ থাকে কত জন, তাঁরা কী করে, তাঁদের মূল জীবিকা কী, ঐ দ্বীপে কী আছে, কীভাবে যেতে হয়, বাড়িগুলো কেমন, কাঠের নাকি কাগজের, মানুষ কী খায়, কী পাখি আছে, সাগর পাড় থেকে ঝাঁপ দেয়া যাবে সাগরে, সারা দ্বীপ ঘুরতে কত সময় লাগতে পারে, কীভাবে ঘোরা যায়, থাকা যাবে?

লেখকের ভ্রমণসঙ্গী, ছবি তুলেছেন লেখক

পিচ্চি একটা জাহাজে চড়তে হবে, ফেরি বলাই ভাল, ছোট্ট পথ, আধা ঘন্টার মতন লাগবে নাকি ইয়ে দ্বীপে যেতে, আসা যাওয়ার টিকেট কেটে ফেললাম। সাথে আফগানিস্তান বন্ধু ওমেড, ওকে আমরা ডাকি ওমেডেটো (জাপানিজ-এ এর মানে হচ্ছে স্বাগতম) অপেক্ষা করছি ইন্দোনেশিয়ান বন্ধুদের জন্য জাহাজে লাইন ধরে উঠলাম কোনো প্রকার ধাক্কা ধাক্কি নেই, মনে হচ্ছিল ঠ্যালা মেরে উঠে যাই, লাফ দিয়ে, সদরঘাট এর মতন, হই হই করে উঠি, ঐ মামা, ভাল টান দিয়ে চালাবা, তুমি হইতাছ গিয়া পাইলট। অনেক অনেক আফ্রিকান, ইউরোপিয়ান, জাপানিজ আরও কত মানুষ ঐ দ্বীপে যাচ্ছে। মে মাসের প্রথম সপ্তাহ, জাপানে গোল্ডেন উইক নামক এক সপ্তাহের মতন একটা ছুটি পাওয়া যায়। এই সুযোগে অনেকেই ঘুরতে বের হয়। আর এই ছুটিতে অনেক উৎসব থাকে লিলি ফুল, নৌকা বাইচ, মৎসজীবীদের মেলা, তারা বাজির উৎসব। হরেক রকম উৎসব লেগেই থাকে। আর ওকিনাওয়াকে বলা যায় টুরিস্ট এলাকা। প্রতি মাসে এই উৎসব ওই উৎসব, এদের মূল আয় টুরিজ্যম থেকে।

পথেই কয়েকটা দ্বীপের দেখা মিলল। মনে হচ্ছিল জাহাজীকে বলি ও পাইলট ভাই, ঐ দ্বীপে একটু ভিড়াও, এক চক্কর দিব, মাত্র এক চক্কর দিয়েই চলে আসব। কথা দিচ্ছি, তুমি শুধু একটু ভিড়াও মনে জেগে উঠা প্রশ্নের উত্তর গুলো জানা জরুরি, খুবই জরুরি। অনেক ছোট্ট ছোট্ট দ্বীপ, মানুষ থাকে, এমনও দ্বীপ আছে মাত্র গুটি কয়েক পরিবার থাকে। তাঁরা থাকে নিজেদের মতন করে, তাঁদের জীবন আলাদা, তাঁদের প্রকাশ আলাদা, তাঁদের চাওয়া আলাদা। হয়ত প্রতি সন্ধ্যায় তাঁরা সাগর পাড়ে বসে, নীল সাগর ধুয়ে দ্যায় পা, শিরশির বালি চলে যায়, পায়ের তল দিয়ে তাঁদের চোখ ভিজে উঠে অতীব আনন্দে। আনন্দের নোনা জল সাগরে মেশে, মিহি গলায় গান ধরে হয়তো, সেই গান দুলে দুলে যায় সাগরের ঢেউয়ে।

ইয়ে দ্বীপে গাড়ি ভাড়া পাওয়া যায়। আমরা ছয় জন সাইকেল ভাড়া নিলাম। সারা দ্বীপ ঘুরব, ছোট এক দ্বীপ, উঁচু নিচু তেমন নাই, যা আছে সাইকেল ঠেলে উঠা যাবে। সাইকেলে উঠেই চলে গেলাম স্কুল জীবনে। লাল সাইকেলে করে স্কুল, প্রাইভেট পড়তে যাওয়া, নদীর পাড়ে যাওয়া চারদিকে নীল সাগর, শুভ্র আকাশ। চকচকে রৌদ্দুরে সাইকেলে উঠেই গান চলে আসল, ছেঁড়ে গলায় গান, চকচকে রাস্তায় আরও ভাল লাগল। আশেপাশে গাছ আর গাছ, দুলিয়ে দুলিয়ে সাইকেল চালানো, মাথা এদিক সেদিক নাড়ানো সাগরের বাতাসে মনে হতে লাগল কেউ নেই, কেউ নেই এই জগতে।

লিলি ফুলের বাগানে পৌঁছেই এক ঝলক সাদার মেলার ছলক চোখে মুখে। বিশাল এলাকা জুড়ে সাদা আর সাদা। পাশেই বিশাল নীল বেগুনি সাগর। ছোট্ট ছোট্ট দোকান আছে। কিছু সাগরের পাড় ঘেঁষে আছে ঘোড়ায় করে চড়ার ব্যবস্থা। হরেক রকম লিলি ফুলের সংগ্রহ আছে। লাল, সাদা-লাল, বেগুনি, হলুদ, কাল, সোনালী, আরও কত কত রং। সব রং যেন লিলি ফুলেই করেছে এরা। কেউ একজন দেখেছে এক রং, করে ফেলেছে সেই রং। লিলি ফুলের প্রজাতি এমনও রং আছে, বোঝাই যাচ্ছিল না এটা কোন রং, কী নাম দেয়া যেতে পারে। এই রং এর অদ্ভুত সুন্দর, বিশাল সাদা লিলি ফুলের বাগানের মাঝ দিয়ে সরু রাস্তা হেঁটে যেতে যেতে অদ্ভুত ভাল লাগা কাজ করে। মনে হতে থাকে ঝাঁপ দিয়ে শুয়ে পড়ি! সাদা রং এর মেলায় আকাশ পানে চেয়ে চিৎকার করি, ওহে ও আকাশ, কিছু রং দিয়ে দাও, দিয়ে দাও এই সাদার মাঝে!

সাইকেল নিয়ে পুরোটা দ্বীপ ঘুরছি, আর ম্যাপ হাতে খুঁজে বের করছি কোথায় কোথায় থামা যায়। পথেই গরুর ফার্ম দেখা গেল। রাস্তার পাশের লিলি ফুল, প্রতিটা পথ থেকেই দেখা গেল। এক পাহাড় চূড়া, কিছু জায়গায় গিয়ে সিঁড়ি চলে গেছে পাহাড় চূড়ায়। অনেক দুর্বল আর গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল, কড়া রোদ্দুরে এমনটা হয়েছে। হয়তো এতক্ষণ টেরই পাই নাই। পাহাড় চূড়ায় উঠতে গিয়ে মনে ধাক্কা দিল পাহাড় চূড়ায় তাকাই আর ঢোক গিলি পথে অ্যান্ড্রিয়ান-এর নতুন বউয়ের হাতের রান্না খাওয়া হয়েছিল বলে দুর্বলতা কম ছিল, ওমেন্ড আর উপরে উঠল না, আমরা উঠবই, যা আছে কপালে! হেইও হেইও করে উঠে গেলাম।

উপরে উঠেই চিৎকার। পুরো দ্বীপটা একবারে দেখা যাচ্ছে। ঐ যে সরু রাস্তা, কিছুক্ষণ আগেও ছেড়ে গলায় চিৎকার করতে করতে সাইকেল চালিয়ে আসলাম। ঐ যে কৃষি খামার পুরো দ্বীপ জুড়ে গুটি কয়েক ঘর, অদ্ভুত গোছানো, রাস্তা একে বেঁকে চলে গেছে। নাম না জানা খামারের পাশ দিয়ে মনে হচ্ছিল, কেউ তুলি দিয়ে এঁকে দিয়েছে। এইখানে লিলি ফুলের বাগান। এই খানে আলুর বাগান। এর মাঝ খান দিয়ে রাস্তা। এই খানে এক পাহাড়, যেই পাহাড়ে উঠেই সবাই চিৎকার দিয়ে বলবে "আহ! কি অদ্ভুত সুন্দর!"

সাইকেল ধরে ফিরতি পথ। পেছনে ফেলে আসা ভাল লাগা মুহূর্ত। মনে হল এই তো কিছুক্ষণ আগেই জাহাজ থেকে নেমে অ্যান্ড্রিয়ানকে নিয়ে সাইকেল বাছাই করছিলাম। এই সাইকেলের গিয়ার আছে, এটা দরকার, একটান দিব, গাড়ির আগে ছুটবে, ড্রাইভার চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকবে। এই তো কিছুক্ষণ আগেই লিলি ফুলকে ছোঁয়া হল। কিছুক্ষণ আগেই সাগরে ঝাঁপ দিতে ইচ্ছে হল। এই তো কিছুক্ষণ আগেই পাহাড় চূড়ায় উঠেই চিৎকার সাগর পানে "ও সমুদ্র! তুই ক্যান এত সুন্দর!"

নীল পানির সন্ধানে

তোফায়েল আহমেদ
শাখা কর্মকর্তা, অডিট সেল

নদী মাতৃক দেশ আমাদের এই বাংলাদেশ। জলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে যেমন আমাদের বেড়ে ওঠা তেমনি জলের সঙ্গে নীলের বন্ধুত্ব সেই আদিকালের। খোলা আকাশের নিচে জল মানেই নীলের খেলা। ধূসর বালুর বুকে এমন প্রাণবন্ত নীলের খেলা দেখার জন্যই এবার ছুটে গিয়েছিলাম নেত্রকোনার বিরিশিরিতে, যেখানে রয়েছে নীল স্বচ্ছ এক নদী সোমেশ্বরী। শুধু তাই নয়, সাদা সাদা চুনাপাথরের আড়ালে লুকিয়ে রাখা অবাক বিস্ময় করা গোলাপি পাহাড়। এই পাহাড়ের গল্প অনেক শুনেছি। বাংলাদেশের মধ্যে একটা চিনামাটির পাহাড়, সেখানে আবার একটা নীল পানির লেকও নাকি আছে! কৌতূহল আর চেপে রাখতে পারলাম না। লাল-সবুজের বাংলাদেশে যে একমাত্র গোলাপি পাহাড়টা আছে, সেটাকে আর কত দিন বা দৃষ্টিসীমার বাইরে রাখা যায়। তাইতো গ্রীষ্মের সেই যাত্রার গল্প এই শীতের শুরুতে শোনাচ্ছি।

রমজান মাস। রমজানের ঠিক শুরুতেই বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা হয়েছে। হল ভ্যাকেন্ট করে সবাই তখন নাড়ির টানে বাড়ির পানে ছুটছে। আমার বন্ধু মোজাম্মেল হোসেন। আমরা আদর করে MOJO বলে ডাকি, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে আর্কিটেকচারে পড়ছে। বিকেলে ফোন দিয়ে বলল তপু (আমাকেও আদর করে বলে) রাতে উত্তরা চলে আয়। আমরা ফ্রেন্ডরা মিলে কাল বিরিশিরি যাব নীল পানি দেখতে। আমি তৎক্ষণাৎ ওর কথায় রাজি হয়ে সন্ধ্যায় উত্তরা চলে গেলাম। বাসের টিকিট বিকেলেই বুকিং দেওয়া হয়েছে। বাসের নাম বিরিশিরি এক্সপ্রেস। ৩রা রমজান। ভোর রাতে বন্ধুর বাসাতে সেহেরী খেয়ে আজমপুর এসে দাঁড়ালাম আমরা ৫জন। বাকীরা মহাখালী থেকে আসবে। সকাল ৬টা। আধ ঘন্টার মধ্যেই গাড়ি চলে এলো। আমরা সবাই হুড়মুড় করে বাসে উঠে পড়লাম। রাস্তা ফাঁকা। চোখের পলকেই গাজীপুর পিছনে ফেলে আমরা এসে পৌঁছলাম ময়মনসিংহে। পথে একটি ছোট্ট ব্রেক নিয়ে আবার জলদি বাসে উঠলাম। বিরিশিরি যেতে নাকি ৩ ঘন্টা লাগবে। সামান্য কুয়াশা পড়েছে, রাস্তার অবস্থা যেন বেহাল চৌরাস্তা। আন্দাজে ঢিল ছোড়ার মতো করে ড্রাইভার বাস ছেড়ে দিয়েছে। চলছে বাস, না না ভুল বললাম বাস লাফাচ্ছে, বাস কি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে নাকি বান্দরবনের পাহাড় দিয়ে যাচ্ছে কিছুই ঠাহর করতে পারলাম না। ছিটে বসে থাকাটাই দুষ্কর হওয়ে দাঁড়ালো কিছুক্ষণ পরে। স্পাইডারম্যানের মতো বাসের দেয়াল আঁকড়ে থেকে পাঁচ ঘন্টা ধরে গান গল্প আর আড্ডা দিয়ে দুপুর ২টায় বিরিশিরি নামলাম। জুমার নামাজটা অল্পের জন্য মিস করলাম। আগে থেকে ওয়াইডব্লিউসিএ রেস্টহাউজে সিট বুক করা ছিল বলে বেঁচে গেলাম। চট জলদি ফ্রেশ হয়ে দুপুরের নামাজ পড়ে নিলাম। তারপর খানিকক্ষণ বিশ্রাম শেষে সবাই মিলে বের হলাম নীল পানির সন্ধানে। রেস্টহাউজ থেকে বের হতেই চিরচেনা গ্রামীণ সবুজ পরিবেশ। গন্তব্যে যাওয়ার জন্য পাকা সড়ক পথের কোনো আধুনিক সুবিধা নেই। গ্রামের মেঠো পথই একমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম। গ্রামের মেঠোপথ দিয়ে টুং টাং বেল বাজিয়ে রিকশায় করে চললাম সোমেশ্বরী নদীর ঘাটে। দুই পাশে বিস্তীর্ণ সবুজ খোলা মাঠ, মাঠের মাঝেমধ্যে একটা করে গাছ। চোখ ফেরাতে পারছি না সবুজের পর্দা থেকে। আরও একটু সামনে যেতেই ছলাৎ করে উঠল হৃৎপিন্ড, এ আমি কি দেখছি! চোখের সামনে টলটলে নীলের সমুদ্র যেন। খানিক আগের সবুজ হারানোর ব্যথা কোথায় ভেসে গেল, কে জানে। যত দূর চোখ যায় সোমেশ্বরীর পানি সোনা রোদে চকচক করছে। রিকশা যত সামনে এগোচ্ছে, ততই ধীরে ধীরে চোখের সামনে ফুটে উঠছে নীলের পরিধি। অনেক দূরের পাহাড় থেকে রিমঝিম করে বয়ে আসা টলটলে পানির কলকল শব্দ মনে মাদকতা ধরিয়ে দিচ্ছে। আলতো করে পা ভিজালাম, কী ঠান্ডা! এক নিমেষেই যাত্রাপথের সব ক্লান্তি ভেসে গেল জলের স্রোতে। দূরের গারো পাহাড়কে বেশি দূরে মনে হয় না এখান থেকে, সোমেশ্বরীর ছোঁয়া পেয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা গারো পাহাড়ও। নদীজুড়ে একটা নৌকা চলে যাত্রী পারাপারের জন্য, আমরাও যাত্রী হয়ে গেলাম। আমরা মোট ১৪জন সাথে এর স্থাপত্যবিদ্যার শিক্ষক। আমরা জলদি একটা ট্রলার ১২০০ টাকা দিয়ে ভাড়া নিলাম আসা যাওয়ার জন্য কেননা দিনের আলো থাকতেই আমাদের যেতে হবে গোলাপি চীনামাটির পাহাড়ের

কোলঘেঁষে বয়ে চলা নীল পানি দেখতে। ট্রলার ছেড়ে দিল। নীলাঞ্জনা সোমেশ্বরী নদীর মাঝ দিয়ে ট্রলার চলছে। তীব্র বেগে কলকল শব্দে বয়ে চলেছে দুরন্ত সোমেশ্বরী। যত দূর চোখ যায় শুধু নীল পানি, আকাশ তার সবটুকু রং দান করে দিয়েছে এই কোমল নদীটিকে। সোমেশ্বরী পার করে তার তীর ধরে বাঁশঝাড়ের ভেতর দিয়ে অনেক দূর যেতে হয় বিজয়পুরের সুসং দূর্গাপুরে যেতে। ধানখেত মাড়িয়ে, সরিষাখেত ছাড়িয়ে সূর্য যখন পশ্চিম আকাশে অস্ত যাবে এমন সময় আমরা পৌঁছালাম টিনামাটির পাহাড়ে।

ইফতারের জন্য পথের ধারে দোকান থেকে পানি, মুড়ি, জুস, ছোলা, পিঁয়াজু আর অন্ধকারে পাহাড়ি পথ চলতে একটা গ্যাস লাইটার। প্রকৃতি এখানে আপন হাতে সাজিয়েছে তার পাহাড়গুলোকে। ছোট ছোট লতাগুল্মের গা মাড়িয়ে উঠতে হয় সেই পাহাড়ের চূড়ায়, তবেই নাকি দেখা মেলে এক আশ্চর্য সবুজ হ্রদের, যার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে গোলাপি পাহাড়টা। দুই চোখে লোভ আর লালসা নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে পড়ি সেই পাহাড়ের চূড়ায়। যত দূর চোখ যায় পুরোটাই সমতল। একটু দূরেই ভারতের বিশাল বিশাল পাহাড়গুলো ঘিরে রেখেছে বিরিশিরি দূর্গাপুরের এই টিনামাটির পাহাড়টাকে। পাহাড়ের উপর থেকেই পুরো বিরিশিরি একেবারে দেখা যায়, ঢাল বেয়ে নিচে নামতেই পাহাড়ের খাঁজ বেয়ে ধীরে ধীরে চোখের আঙ্গিনায় আলো ফেলে সবুজ হ্রদের পানি। ধবধবে সবুজ এ পানি এতটাই স্বচ্ছ যে তা নিচের সাদা চুনাপাথরের মেঝেটাও স্পষ্ট দেখা যায়। সবুজ হ্রদের ঠিক গা ঘেঁষেই দাঁড়িয়ে আছে গোলাপি পাহাড়। দেয়ালজুড়ে চুনাপাথরের প্রতিটি কণায় গোলাপি আভা। গোলাপি এই পাহাড় মিশে গেছে একেবারে সবুজ হ্রদের তলদেশ পর্যন্ত। সবুজ আর গোলাপি রং মিলে পানির নিচে তৈরি করেছে আশ্চর্য সুন্দর জগৎ। এই সৌন্দর্য দেখার জন্য মাছ বা অন্য কোন প্রাণি দেখতে পেলাম না পানিতে। সম্ভবত চুনাপাথরের রাসায়নিক বিক্রিয়াজনিত কারণে কোনা প্রাণি বাঁচতে পারে না। আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমরা পরিপূর্ণ নীল পানি দেখতে পেলাম না, আরও বেশি শীত পড়লে তখন পানি আরও নীল হয়ে যায়, এজন্য ফেব্রুয়ারি-মার্চ হলো নীল পানি দেখার জন্য সবচেয়ে আদর্শ সময়। দেখতে দেখতে বেলা চলে যায়, গারো পাহাড়সহ আরও অনেক জায়গা আমাদের দেখার কথা ছিল কিন্তু পারিনি সময়ের স্বল্পতার কারণে। আজান দিল মসজিদে। সবাই মিলে ইফতার করে নিলাম। সন্ধ্যা ৭টা বেজে গেল। এবার ফেরার পালা। মনটা খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠল আবার সোমেশ্বরী দেখতে পাব বলে। স্থানীয় ৭টা মটর সাইকেল ভাড়া করে ফিরে এলাম নদীর ঘাটে। ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন সোমেশ্বরী নদীর মাঝখান দিয়ে মোমবাতি আর লাইটারের আলো জ্বালিয়ে দুই ঘন্টায় শান্ত নদী পার হয়ে আমরা প্রফুল্ল চিত্তে ফিরে এলাম রেস্টহাউজে। ভোর রাতে সেহেরী খেয়ে পরদিন রওনা দিলাম ঢাকার উদ্দেশে। আর এভাবেই তৃপ্ত হলো বিরিশিরির নীল পানি দেখার অতৃপ্ত বাসনা।

নীল পানি | চিরসুন্দর সোমেশ্বরী | টিনামাটির গোলাপি পাহাড় | আমরা বন্ধুরা

Freedom from Stress

Fahmida Jerin Anim
Department of International Relations, BIR15

Stress is a feeling of pressure from the view of psychologists. It can cause psychological or physical pain. Little stress may be beneficial, even healthy as positive stress improves athletic or academic performance. It also creates motivation, adaptation, and reaction to the environment. But excessive amount of stress may cause mental or physical harm. It can increase the risk of stroke, heart attack, and mental illnesses such as depression, anxiety, insomnia, hypertension, irritation, anger disorder etc.

Genres of Stress:

There can be three types of stress:

1.The stress that is generated from the loss of a loved one, job, wealth;
2.The stress that is formed due to having impossibly high level of aspiration;
3.The stress that is related to an individual's status, power, health, security.

Time –Period

Almost everyone of us go through these kinds of stresses at various stages of our lives. During the early life, a child has to cope up with the family people and demands of school. At the time of later adolescence, boy-girl relationship problems are faced. After completing university or in some cases of early marriage, problems of the first year of marriage causes stress. Academic stress of college and university years and career choice,

getting a job and entering into professional life cause more stress. These can be quite serious at times and can lead to early divorce. The pros and cons of having children and taking care of them bear heavily on women, while men usually have more career stress.

Every individual has a personal way of reacting to the problems they are facing; drug addiction, anxiety, obsession, anger, sleeplessness, compulsive disorder etc. are seen. Even ulcers are a symptom that can be developed at any age, among children too.

"I wish...I wish I were dead..."
"And what use would that be to anyone?"
— J.K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows

Kids need to be pampered moderately, not too much neither too less. In some cases, parents need to be a bit strict, on the other hand, they need to show love and affection towards them being friendly at the same time. Being too strict can lead a child towards destruction. Children need the opportunity to confront various problems at an early age when they are gradually learning to cope with them. If parents intervene prematurely, it might prevent the child from developing tolerance for problems or achieving problem solving techniques and patience.

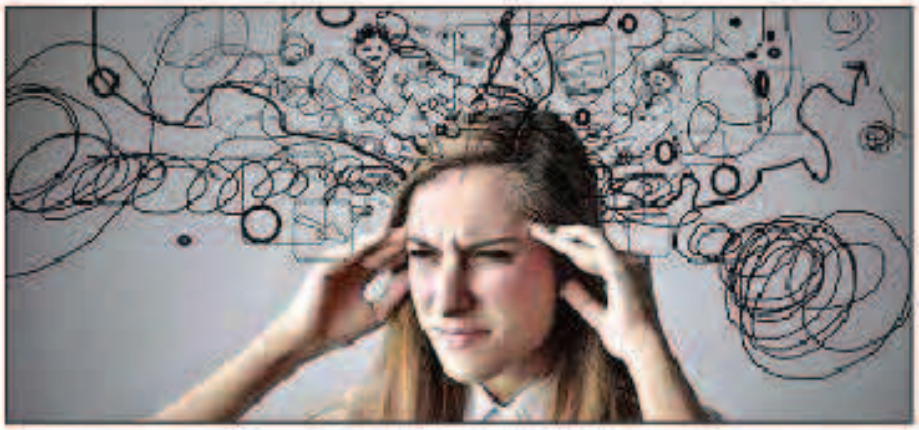

What to do?

If a family member is under stress that he or she may not be aware of but other members can see, then he or she should not be taken to a psychiatrist immediately. Rather getting a good medical examination is always a standard procedure. It will give the patient an opportunity to express his or her feelings, inner worries. The doctor often gives some general words of advice for implementation by the patient him/herself or through the help from friends, family or other people. Only in the cases of extreme difficulty where the patient is unwilling to respond should get psychiatric treatment or attention. We should never forget that mental stress is a sensitive issue. So such patients should be dealt with love, patience and affection. It is high time that this matter should be discussed publicly rather being ignored.

"You must learn to let go. Release the stress. You were never in control anyway."
— Steve Maraboli, Life, the Truth, and Being Free

Victim or Victor?

Tahsina Zaheen
Department of English, 2nd Batch

Ennui dragged herself up with such a reluctance that it seemed enforced. Her mind instantly frolicked to last night's "adventures." She could recall everything including all the minute details with a slight, yet, instinctive flinch on her face. Her hands started groping for a blanket with her eyes fixated upon a point on the wall. As her fingers made contact with the fine silk, she tugged it to her chest without interrupting her contemplation.
Of course, it had just been a dream. A pleasant nightmare, to be precise.

A thud ushered from the empty space that she claimed to be her living room, forcing her to return to her reality. But she was not taken aback. Ennui asked herself what could possibly be the reason behind her callousness towards such a rare phenomenon. Maybe she knew something. Maybe something had happened last night. Maybe after all, not everything could be preserved in her fiddling human brain. Her heart began to race. With great effort, she climbed out of bed and started for the living room. Her rate of perspiration appeared to be proportional to the rate at which she was pacing forward, knowing what was coming in the near future.

Was she prepared for it?
She decided against fleeing. With the mighty sun adorning the room with her rays through the gaps between the drapes, Ennui's features came into sight. She hurriedly covered half of her face with her tidy, brown hair which complemented her personality to the extent that was deemed average. Average enough to dismiss her intuition entirely. She strode forward.

As soon as she was about to reach for the door knob, she noticed a shiny object on her carpet in front of the main door. She retreated a few steps. "Must be Morty playing a sick joke, that evil bastard," Ennui ragingly whispered under her breath. "MORTY, I KNOW IT'S YOU! I'LL KILL YOU, I SWEAR!" she bellowed, as a reassurance to herself that it was none but the imbecile lump of a meat she called her friend. The voice from the other side coughed a bit, paused for two distressing seconds, and retorted, "An hour left to choose, miss."

Cadence

So it wasn't a dream?

Ennui's nervous system took a while to process all the information and at the advent of her comprehension of the whole situation, her eyes began widening. With drops of sweat embellishing her forehead, Ennui's mind pondered over the chilly voice that she had just heard. How can a voice be so unwelcoming and tranquilizing at the same time? The contradiction in her notion almost made her laugh out loud, but she only managed to get a whimper out. Is she going insane? She heard about schizophrenic patients from her father, is this what it is? If so, would she have had this realization? She felt giddy with all the questions clogging up her brain.

She wished her mother had been there. She would have known how to escape from such a plight. With this prospect clearing up the fuzz in her head a bit, she ran to find her phone. Speed dialing her mother, she began biting into her nails intently. Her mother promptly answered the call. It almost felt like she had been waiting for the call. Funny. But before Ennui could even blurt out a word, her mother spoke up, "Choose, dear. There isn't much time left." After a long second of chaotic silence, Ennui heard the other side hang up.

Ennui Ronan previously had been Renee Ronan, before her name got altered to Ennui, derived from the French verb "ennuyer", owing to her French ancestry, which means "to be bored." When she had been merely a year old, no toys could pacify her for long. Clenching her fists as hard as she could, Ennui used to shriek in boredom. Nothing piqued her interest. But today, everything struck as quite riveting. It was undoubtedly frightening, somewhat even sinister, yes, but yet beguiling.

It got pretty discernible to her as to what her next actions should be. Not that she had ever been the most obedient child, but to a person who is in utter indecision and apprehension, the mother's words are scripture. "Thank you, ma." Ennui mumbled.

The clock on the wall of the living room struck 8:30. It had been a solid half an hour since she had stepped out of her bed and approached towards the door. She had 30 minutes to herself. She began wondering if the man standing outside, had done this to anyone else. If so, then how did he choose the victims? Victims or victors? And if not, then why her? She felt her stomach churning. There was no time for such nonsensical thoughts clouding her judgement. She needed to choose and then it would all be over, for good. Or for bad. Who knew?

Whoever waited outside patiently, did know. He could hear her thoughts, her array of multifarious and perplexing thoughts. Beaming with joy, he looked at the sun. "13 minutes," he smirked.

Just at the moment, the door opened and Ennui emerged.

"I have decided."

"Have you already?"

"Yes."

An ominous curve appeared on his face.
Ennui could not bear to see the glory that appeared on his visage.
She sighed, "Bless you, whoever you are."
This seemed to baffle him a bit. He straightened his posture and commanded, "Choose. Now."
"I choose this. I choose the world. I choose people. I choose who I am, where I am."
"Beyond is what you really desire."
"No."
"Think ab-"
"NO."
"Why?"
"Because this is home."
"But surely not eternal peace and happiness, eh?"
"No, but surely cozy."
The luminosity of Ennui's smile was blinding. Just as she was about to turn back, she stopped midway, picked up the shiny object that was still lying on the carpet.
"You might need this back."
The scythe had been restored to its keeper.

Reminiscence

Tasnim Naz
Department of English, Batch 02

It was a hot summer day during the middle of July and Urusa felt flustered. She hadn't eaten anything since she got up from her lopsided bed and it was 9:30 in the morning. She felt a bit of a headache coming her way as she listened to the muffled voices of her parents in the next room. Urusa had no interest in eavesdropping, which perhaps was unnatural. Human beings are curious by origin. But, Urusa understood, with no effort at all, that her parents were at a disagreement about something or another. Again.

The apartment she lived in was stuffy, to say the least. The only place where you could get a sense of the outside world's time and space was the balcony. Urusa spent many good hours at this very balcony, looking out at people passing by and conjecturing a fantasy of what could happen had she traded lives with the passerby's.

Her stomach growled. She debated whether she should go inside the kitchen and search for knick-knacks, but decided against it. She learned, a long time ago, to stay out of the way when her parents argued. Any attempt at involvement with their verbal war would back-fire on her horribly.

She was still in her school uniform, schools shoes on, hair in plaits. Her mother would not let her leave for school today. She would take Urusa away with her to their aunt's house. When Urusa asked her mother whether her father would be joining them, she replied with silence. Silence usually meant no. In a way, she was glad she wouldn't have to go to school today. She loathed the history teacher, who always exhibited a constipated face and a croaky, rude voice. Urusa was relieved to be spared from the presence of her history teacher, even for a day.

The voices floating from the next room stopped. Urusa peeped into her parent's bedroom to get an idea of the situation. Her mother was there, clothes in her hand, packing up an old dusty suitcase. Her eyes were puffy and pink against her milk white skin. She asked her mother how long they would be gone to her aunt's house. She did not reply, not that Urusa expected she would. Instead, her mother asked her to pack all her books and copies into a bag. She obliged. Any effort at questioning her mother would be fruitless.

Robotically, Urusa did what her mother had asked her to do. She picked up her old, second hand school books and one by one put them inside a rancid bag. From the corner of her eye, she saw her mother packing up all her faded old clothes. Her eyes were not as puffy

anymore and her face lacked any signs of emotion. Urusa tried to remember the last time her mother had laughed out loud. It took a while, but a hazy memory came to mind. Six years ago, she remembered her mother laughing at a dirty zoo. Urusa remembered this because her mother was laughing at something Urusa's little brother had done. He had, naively, tossed a peanut inside a monkey cage. Her mother roared with laughter as the three monkeys in the cage started to fight for that single piece of peanut. Urusa's baby brother was ecstatic and asked for another peanut to throw at the monkey's cage.

Remembering this, Urusa grinned a little. This memory seems to be a product of another time, long long ago. A time when her parents did not fight as much. A time when they actually talked to each other in a normal tone of voice. A time when her baby brother would light up their lives. Urusa remembered that the last time her mother laughed was just before her brother left them. Maybe he took her laughter with him, to keep him company.

Urusa finished packing her books and reached for an old teddy bear her brother used to own. If you tried really hard, you could still get a whiff of her brother's scent. Of course, it could all be psychological, but to Urusa, it was the most tangible thing in the world. As she packed the teddy bear, her mother asked her to leave the teddy, and said that they would not take it with them. Urusa did not have the heart to protest. She complied.

As Urusa and her mother drove away in an old yellow taxi, she wondered what she would miss the most about her old home. Would she miss her balcony? Probably not. She would probably not even miss her father, who she left behind. No, what Urusa would miss dearly, is the stained, fragrant teddy bear she left behind.

Zulker Nayen Mahmud
Department of Development Studies, DS-16 (1st Batch)

I Long for That Day

It was a fine morning.
I was still in bed, not sleeping.
Full straight, legs crossed & hands folded behind head.
Looking blankly at the fan. All around me was silence. Alone I was.
My phone rang. Office. Duty calls, I thought.
But it was not that.
A letter!
A scribbled piece of paper.
From a faraway land. From you.
I walked the pitch blacked road under the blue sky.
Walked miles but felt nothing. I went to my office.
Took the letter at hand.
A letter from faraway land
There it was, my name on it,
On the back your name.
I read the letter a thousand times.
Where you said,
"I want to use your surname for the rest of my life."

In a faraway land, I sit on the sand.
Looking at the moon, I sing for you.
I long for the day, to hold your hand
In sea, in air and in the land.
In happiness and in grief, in storm and rain,
In sun and moon. I shall never let go.
I long for the day to hold your hand
And walk this land. Over and over again.

K.M Arefin
Department of English, Batch: 02

A Beautifully Meaningless Waste

I saw the lights and I saw the hope,
I saw the dreams that were bound to be my own.
No sooner the lights gone dim and the dreams had gone frown.
My skins got wretched and the systems face was shown.

As tight as an avenger holds his agony to avenge,
As hard as Zeus holds his sphere within his range.
It hit me in the heart and hopes disappeared.
My dreams flushed out and nothing was repaired.

I got faint and I got lost
In a world we call reality which may not worth a shot.
Ended up in this system, being caught in vein.
A meaningless life but nothing to gain.

I built a home, I built a place, I kissed a girl
But I never liked the taste
Hair had whiten and teeth had stained
Descendents passed on with my same old pain.

Days were darkening and nights were short,
My sight started fading and my body was about to rot.
I could feel death near me, knew he wanted my taste.
Time went by as I turned into a beautifully meaningless waste.

Muhammad Shafiuddin
Program Coordinator, Department of Sociology

Time for Everything

Take time to work,
It is the price of success.
Take time to think,
It is the source of power.
Take time to play,
It is the secret of youth.
Take time to read,
It is the source of wisdom.
Take time to do good,
It is the road to happiness.
Take time to dream,
It is the way to the moon.
Take time to love,
It is the privilege of God.
Take time to serve,
It is the purpose of life.
Take time to pray,
It is the key to revelation.
Take time to laugh,
It is the music of the soul.

TABLE MOUNTAIN
A WONDER OF NATURE

Maj Mohammad Mahmudur Rahman Niaz, psc
MBA (Professional)

Cape Town city is situated in the south-west corner of South Africa along the coast of Atlantic ocean. Table Mountain lies in this city. It is a flat-topped mountain forming a prominent landmark overlooking the city. The mountain forms part of the Table Mountain National Park. It is approximately 260 million years old. Antonio de Saldanha was the first European to land in Table Bay. He climbed the mighty mountain in 1503 and named it 'Taboa do Cabo' in his native Portuguese which means Table of the Cape. The flat ground extends over a distance of more than 2 km. It forms a dramatic backdrop to Cape Town. The highest point on Table Mountain is towards the eastern end of the plateau. Its top is around one thousand meters above sea level and often covered by orographic clouds. This mountain is basically made of sandstone, granite and mudstone of millions of years old. The local Khoekhoen and San tribes call it "Hoerikwaggo" meaning Sea Mountain. This mountain saw the footprints of several famous travelers and explorers. Cape Town International Airport serves both domestic and international flights and serves as a major gateway for travelers to this region.

During my South Africa tour on May 2016, I could visit this mountain. I along with one of my colleagues hired a taxi from Cape Town and started for the Mountain. At the last leg, the taxi climbed uphill and dropped us at the base of cable car station. The Table Mountain cableway takes passengers from the lower cable station on Tafelberg road to the top of the mountain. The cableway was officially opened in 1929. In 1997, the cableway was extensively upgraded. Now the cars can take around 65 passengers. The new cars give a faster journey to the summit and rotate through 360 degrees during the ascent or descent. Thereby, it gives a panoramic view over the city surrounded by the Atlantic ocean. The top cable station offers curio shops and a restaurant. The self-service restaurant at the top offers foods ranging from hot breakfast, meal of the day, snack menus and coffee. We noticed walking trail along the edge of the mountain and number of view points at regular intervals.

Figure 1: Location of Table Mountain

Figure 2: Cable car of Table Mountain

Figure 3: Cape Town city at a glance from Table Mountain

We continued walking southwards following the trail. From the viewpoints we could get the full fascinating scene of Cape Town city. Looking towards north-west we could see even the historic Robben Island inside Atlantic Ocean. Since the end of the 17th century, this has been used for the isolation of mainly political prisoners. Nelson Mandela, Nobel laureate and former president of South Africa was imprisoned here for 18 years. Today it is a World Heritage Site.

Along the way we saw extensive flora and fauna that is the natural heritage of the region. Table Mountain has an unusually rich biodiversity. Table Mountain's vegetation types form part of the Cape Floral Region protected areas. These protected areas are a World Heritage Site. We noticed fog of various densities scattered over the mountain. We heard that here dense mist, cold weather or extreme heat can descend without warning at any time of the year. After certain distance we noticed various boards where necessary information like history, flora, fauna and visiting tips are inscribed.

Figure 4: The author at the top of Table Mountain

Table Mountain is also home to porcupines, mongooses, snakes, lizards, tortoises, and ghost frog. The mountain cliffs are home to several raptors species. That includes the jackal buzzard, booted eagle, African harrier-hawk, peregrine falcon and the rock kestrel. We encounter few friendly little creatures that wander around bushes called the 'Dassies'. These shy furry animals look like rabbits but much bigger in size. Bush fire or wild fire is frequently seen on this mountain. Presence of moss or lichen is very common on maximum rocks.

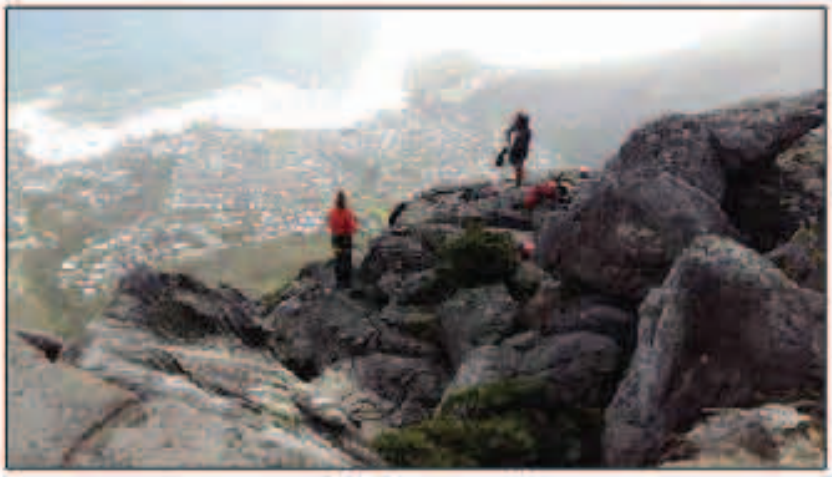

Figure 5: Rock climbers at Table Mountain

Hiking on Table Mountain is popular amongst locals and tourists. A number of trails of varying difficulties are available here. Hiking takes around 1 to 3 hours depending on one's fitness level. Good maps of all the routes are available at bookshops and outdoor recreation stores. We were fortunate to see few rock climbers. The popular climbing route is on cliffs below the upper cable station. No bolting can be done here and only traditional climbing is allowed. Commercial groups also offer abseiling from the upper cable station.

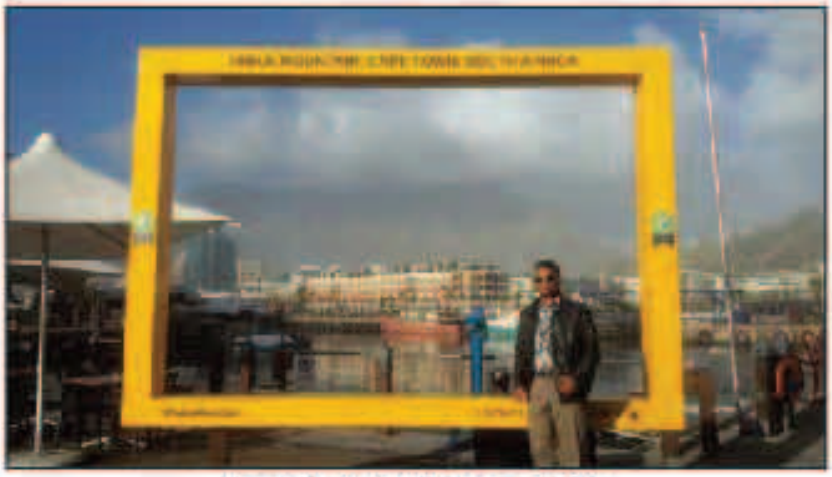

Figure 6: Yellow frames at City

We found visitors were enjoying and taking photo snaps. Most of the places had no barrier or wall along the edge. Finally we returned to foot hill by cable car. In November 2011, Table Mountain was named one of the new seven wonders of nature according to votes received. It is the only terrestrial structure in the world to have a constellation named after it. In the city we saw few giant yellow frames stand at various places and offers unbeatable view of Table Mountain. I felt very fortunate to visit one of Earth's most awesome and naturally splendid icons.

Visit to 'Jamhuri ya Uganda'

Wing Commander Nasrin Sultana Siddiqua, psc
Associate Professor, Business Administration in Management Studies

I thought, as tourist spots, African countries are almost always looked down upon. Since this continent is comparatively poorer than Europe or America, this may happen. As much as the tourists rejoice about their trips to, America or Asia, they seem to dislike considering Africa for touring. The case might have been the same for me, as I also held the same beliefs. I didn't think it to be a worthwhile visit, but I was about to be proved wrong; although that happened much later.

It was 9th of October 2013. We reached Entebbe Airport, the airport of Uganda. The Swahili people called Uganda as "Jamhuri Ya Uganda". As a part of my service career, I had the opportunity to have UN Mission in the Democratic Republic of Congo (DRC) for a year. It is not possible for the international flights to land directly in DR Congo. Boarders have to get off at Uganda and the rest of the distance has to be travelled by smaller UN planes. We were working under the Ituri Brigade command where Brigadier General Shikdar sir (Present Dean of FSSS, BUP) was our true guardian. We were 358 Bangladesh Air force (BAF) personnel with Bangladesh Army contingent worked brotherly for this brigade. However, at first sight, Uganda's famous airport, this Entebbe International Airport did not seem likable at all; though it has history and its popularity is great.

Simplicity of the people:

I was living in DRC as the Head of Finance. All types of financial affairs of the BAF contingent I had to manage at the banks in Uganda. I was also given the job of handling the financial affairs of BANAIR HOUSE: a resort of Bangladesh Air Force, where the boarders stayed for flights to and from Bangladesh. As a result, I had to travel to Uganda very frequently.

I got the opportunity to talk to the local people who were very simple-minded; and their concerns were hardly as complicated as our people's. Sometimes, we shared our snacks with the staff engaged at our service; and when we went to the banks, standing at the back of long queues, the staff would return our regards by helping us move through the lines faster, and worked with the local people

The Food:

Like our rice, they take Cassava as their staple, which look a bit like potatoes and are available at their local markets. They take it processed or steamed. Sweet potatoes or fried bananas are some of their most favorite foods. When we visited the markets, we looked for Halal foods first, and we loved fish much. Their fried Telapia with French fries and a small, full bowl of mayonnaise with a glass of Avocado juice was really cheap, but delicious.

Cassava Roots

Banana Fry

Shopping at the city:

Ugandan business basically is China-based. We used to go for shopping to buy curtains, shoes etc. A big, chaotic Chinese shoe market had a huge collection of Chinese-made and local shoes as well. We got curtains from their curtain shops. We told everyone that they were cheap; but in reality, that was to console ourselves. We were actually buying them as presents for our families who were 7000 km (only!) away from us. Buying something for them meant their love and affection resided with us.

Woodcraft:

A huge number of wood arts are available there. They crafted wood, as well as imported from Kenya and Rwanda for making show pieces, miniature animals, tables, chairs etc. I bought a pretty big no of showpieces from there. Now in my living room there's 'A Little Africa' where I arranged all those pieces.

African wood work

Jewelry:

We found a huge number of small cottages where local people sold jewelry made of cane, wood, paper, beads etc. Their diverse designs and styles left me in awe. It also understood then, why African women look so picturesque all the time.

African jewelry

Transport (Boda Boda):

Boda Boda (hired motorbikes) are as common in Africa as our South Asian rickshaws. It's almost like our 'Pathao' (ride sharing and all). Ugandan Boda Boda are driven by males only; and its travelling fares are very cheap as well. Though we were restricted from riding it, we had to overlook the rule for its economy rate. Everything was fine, except the drivers always smelled of sweat. Unfortunately, the local hardworking people weren't the most hygienic of people, but their hearts were very pure.

Victoria Lake:

Our BANAIR HOUSE was built at the bank of Lake Victoria. This lake connects 3 countries: Uganda, Tanzania and Kenia. It's a really beautiful sight to see; even though so far I only got to see it in Uganda. I used to sit by the lake in the evenings almost every day. Its gentle breeze always made me emotional. Street hawkers sold many items there. They were many mouth-watering street foods, and their flavor felt amplified by the lake.

Itanda Falls:

It's a thunderous waterfall, located at Jinja. We heard its roars miles before we even reached there. There were arrangements for water-rafting, bungee-jumping, safaris and many more arranged by organizers, round the clock. We wanted to experience them but didn't dare to join.

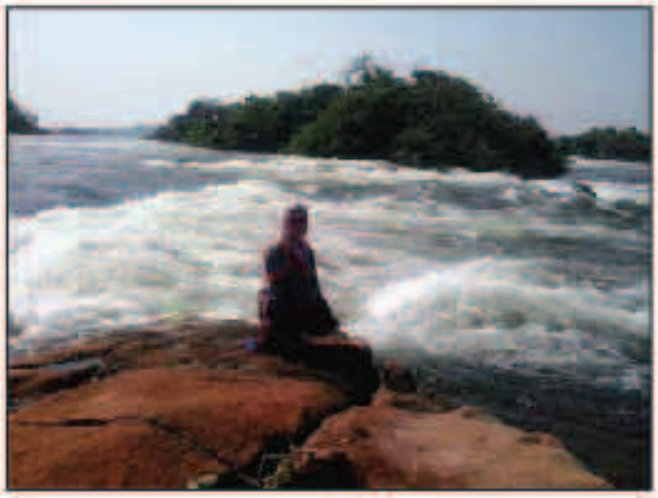

Itanda falls

Source of Nile:

The source of Nile placed at Jinja. We visited that charming place, where history speaks about the two British voyagers, John Hanning Speke and his expedition-mate Richard Francis Barton, who discovered the source of Nile. Though it's a controversial issue about its discovery, but these two gentlemen bring a huge crowd of tourists to visit this place every year. We'd been there for a whole day. A big boat took us to the exact spot; the marked source of the river. To mark this spot vigilant, few small huts were built: as sight-seeing attraction, as well as photo props for tourists. We also took photos and became a tiny part of Nile's history.

Africa-people of pure souls:

Africa may fall short while we compare it with the economies of other continents, but they have immense natural resources, Mother Nature's grace and unique human compassion. I have travelled some European countries even in my heart; this continent is way ahead of others. Staying with Africa's people for a year changed my beliefs about them. That's why these trips made me comprehend that no matter what the people's race or culture is, they're respectable in their own right.

আলোকচিত্রে বিইউপি

মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাথে বিইউপি ভিসি সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন

বিইউপি উপাচার্য ইউজিসি চেয়ারম্যানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন

মহামান্য রাষ্ট্রপতি বিইউপি এ 'বঙ্গবন্ধু চেয়ার' নামক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন করেন

বাংলা বর্ষবরণ-১৪২৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের সাথে বিইউপির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ

বাংলা বর্ষবরণ উপলক্ষে শিক্ষার্থী কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করছেন বিইউপির উপাচার্য

বাংলা নববর্ষ-১৪২৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচিতে রক্ত দিচ্ছেন এক শিক্ষার্থী

বিইউপির সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে ক্রেস্ট প্রদান করা হচ্ছে

১০ম বিইউপি দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে দলীয় নৃত্য পরিবেশনা

Multi Linguistic Cultural Program অনুষ্ঠানের একাংশ

প্রাক্তন সেনাপ্রধান জেনারেল আবু বেলাল মোহাম্মদ শফিউল হক, এসবিপি, এনডিসি, পিএসসি বিইউপি পরিদর্শনকালে বিভিন্ন স্থাপনা উদ্বোধন করেন

১০ম বার্ষিক সিনেট সভায় মাননীয় চেয়ারম্যান বক্তব্য রাখছেন

বিইউপির ১০ম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে মাননীয় উপাচার্যের অংশগ্রহণে বর্ণাঢ্য র‍্যালির একাংশ

"বৃক্ষরোপন ২০১৮" উদ্‌যাপন উপলক্ষে বৃক্ষ রোপন করছেন মাননীয় উপাচার্য

"বসন্তবরণ ১৪২৪" উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করছেন বিইউপির এক শিক্ষার্থী

অগ্নি নির্বাপণ মহড়ায় বিইউপির বহুতলভবন থেকে জরুরি বহির্গমনের দৃশ্যপট

অগ্নি নির্বাপণ মহড়ায় বিইউপির বহুতলভবন থেকে জরুরি বহির্গমন শেষে প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রে নেওয়া হচ্ছে

বিইউপি আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার অংশবিশেষ

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করছেন মাননীয় উপাচার্যসহ শিক্ষক, কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থীবৃন্দ

বিইউপি মাননীয় উপাচার্য BUP Infotech Club এর উদ্বোধন করছেন

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বিইউপির মাননীয় উপাচার্য

ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভায় অংশগ্রহণকারী বিইউপি শিক্ষার্থী

মুজিবনগর দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করছেন বিইউপির এক শিক্ষার্থী

স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে বক্তব্য রাখছেন বিইউপি শিক্ষার্থী

Faculty Day 2018 উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিইউপির মাননীয় উপাচার্য বক্তব্য রাখছেন

"Bangladesh: The Next Level of Development" শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন বিইউপির মাননীয় উপ-উপাচার্য

আন্তর্জাতিক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন বিইউপির মাননীয় উপাচার্য

বিইউপিতে 'Strategies to Prevent Sexual Harassment' শীর্ষক আলোচনা সভায় উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ

"Annual Performance Management: Bangladesh Perspective" শীর্ষক কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন ইউজিসির সম্মানিত চেয়ারম্যান

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৯৮তম জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন এক শিক্ষার্থী

বিইউপিতে "Climate Change Concern: Bangladesh Perspective" শীর্ষক সেমিনার এবং "Sena LPG-BUP Environmental Fest 2018" অনুষ্ঠিত

"উত্তরআধুনিকতাবাদ ও স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা সাহিত্য" শীর্ষক সেমিনারে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

UNILEVER BIZMAESTROS 2018 এ চ্যাম্পিয়ন দলের সঙ্গে বিইউপি শিক্ষকবৃন্দ

বিইউপি শিক্ষার্থী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট থেকে "প্রধানমন্ত্রী গোল্ড মেডেল" গ্রহণ করছেন

গবেষণায় অসামান্য অবদানের জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট হতে বিইউপি শিক্ষকের স্বর্ণপদক গ্রহণ

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন বিউইপির শিক্ষার্থীবৃন্দ

ভারতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সাফল্য অর্জনকারী বিইউপির শিক্ষার্থীবৃন্দ

Liberation War Museum কর্তৃক আয়োজিত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বিইউপির শিক্ষার্থীবৃন্দ

থাইল্যান্ডের ব্যাংককে অনুষ্ঠিত Global Entreprencurship Bootcamp 2018 এ অংশগ্রহণকারী বিইউপি শিক্ষার্থী

Battle of Mind' 18 এ সাফল্য অর্জনকারী বিইউপি শিক্ষার্থীবৃন্দ

যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বিইউপি দল

নেপালে অনুষ্ঠিত বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বিইউপি দল

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় মডেল ইউনাইটেড নেশন কনফারেন্সে অংশগ্রহণকারী বিইউপির শিক্ষার্থীবৃন্দ

Corporiddlerz 2018 এ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন বিইউপির উপাচার্য ও উপ-উপাচার্য

এস ও এস শিশু পল্লী পরিদর্শন করছেন বিইউপির ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থীরা

বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি পরিদর্শন করছেন বিইউপির বিবিএ-জেনারেল এর শিক্ষার্থীরা

বিইউপির শিক্ষার্থীরা ডিবিএল গ্রুপ পরিদর্শন করেন

বিইউপির আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের শিক্ষার্থীদের বিপসট (BIPSOT) পরিদর্শন

Cadence

পোশাক শিল্প কারখানা পরিদর্শন করছেন বিইউপি শিক্ষার্থীরা

বিইউপি শিক্ষার্থীরা পোশাক শিল্প কারখানা পরিদর্শন করছেন

বর্ষাবরণ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করছেন বিইউপি শিক্ষার্থীবৃন্দ

বিইউপিতে আন্ত মডেল ইউনাইটেড নেশন কনফারেন্স-২০১৮ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন সাবেক রাষ্ট্রদূত জনাব ফারুক সোবহান

BUP ICT Fest-2018 এ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন বিইউপির উপাচার্য ও উপ-উপাচার্য

বিইউপি এ IEEE Branch Fest 2018 অনুষ্ঠিত

বিইউপি "Film & Drama" ক্লাবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির সাথে ম্যাস কমিউনিকেশন অ্যান্ড জার্নালিজম বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ

বিইউপিতে Robotics Club "World Arduino Day" উদযাপন

"Corporiddiz 2018" প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থীদের সাথে প্রধান অতিথি বিইউপির মাননীয় উপাচার্যসহ অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

বিইউপির বিজয় অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত Law Debate এর অংশবিশেষ

বিইউপিতে আইসিটি ফেস্ট-২০১৮ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করছেন মাননীয় উপাচার্য এবং মাননীয় উপ-উপাচার্য

Intra BUP Photography and Art Exhibition পরিদর্শন করছেন বিইউপির মাননীয় উপ-উপাচার্য

বিইউপি লিটফেস্ট ২০১৮ এর সমাপনী অনুষ্ঠানের একটি পরিবেশনা

বিইউপির বিজয় অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত ECONTALK 2018 এর একাংশ

বিইউপির Short Film Contest এ নাটক পরিবেশন করছেন বিইউপি শিক্ষার্থীবৃন্দ

বিইউপি আইসিটি ফেস্ট ২০১৮ এ প্রদর্শিত একটি স্টলের চিত্র

বিইউপির আন্তঃবিভাগ ফুটবল প্রতিযোগিতার একটি অংশ

আন্তঃবিভাগ ভলিবল ও ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের সঙ্গে বিইউপির উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

আন্তঃবিভাগীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দলের হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন বিইউপির মাননীয় উপ-উপাচার্য

বিইউপি আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার অংশবিশেষ

বিইউপি আন্তঃবিভাগ হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতার অংশবিশেষ

বিইউপি আন্তঃবিভাগ ক্রিকেট প্রতিযোগিতার একটি অংশ

বিইউপি আন্তঃবিভাগ ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভাগের ডিন ও শিক্ষকবৃন্দ

আন্তঃবিভাগ ইনডোর গেমস প্রতিযোগিতা ২০১৮ এর একাংশ

বিইউপি এবং গ্রামীণফোনের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত

সাইরা ফার্মেসি কোঃ লিমিটেড, জাপান এবং বিইউপি এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

বিইউপি পরিদর্শন করেন আরব আমিরাতের প্রতিনিধি দল

বিইউপি এবং ইউনিভার্সিটি অব ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস এন্ড ইকনোমিক্স, চীন এর সাথে সমঝোতা স্মারক অনুষ্ঠিত

বঙ্গবন্ধু চেয়ার পরিদর্শন করছেন ইউএন প্রতিনিধি দল

বার্ষিক বনভোজন ২০১৮ এ পুরস্কার বিতরণের একাংশ

বার্ষিক বনভোজন ২০১৮ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

বার্ষিক বনভোজন ২০১৮ এ পুরস্কার বিতরণের একাংশ

বিইউপি ক্যারিয়ার অ্যান্ড এডুকেশন ফেস্ট-২০১৮ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের সাথে মাননীয় উপাচার্যসহ অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

বিইউপির ফাইন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত Anti-Drug Campaign অনুষ্ঠিত

বিইউপির ভর্তি পরীক্ষার হল পরিদর্শন করছেন মাননীয় উপাচার্য

বিইউপিতে বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা কোর্সে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের একাংশ

"Loan Default Culture in Banking Sector of Bangladesh: The Way Forward" শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর

বিইউপি এবং বেক্সিমকো টেক্সটাইল অ্যান্ড অ্যাপারেল লিমিটেড এর সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত

ফটোসেশনে শ্রেণি শিক্ষকের সাথে এমবিএ প্রফেশনাল এর শিক্ষার্থীবৃন্দ

মাস্টার্স অব ইনফরমেশন সিস্টেমস সিকিউরিটি (এমআইএসএস) এর শিক্ষার্থীদের গ্রুপ ফটোসেশন

বিইউপি ফ্যাকাল্টি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের সমাপনী অনুষ্ঠানে বিইউপির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে শিক্ষকবৃন্দ

"Accreditation in Higher Education: Importance and Challenges" শীর্ষক কর্মশালায় উপস্থিত বিইউপির উচ্চপদস্থ কর্তকর্তাবৃন্দ